Anjali

Padma–asana

Padma or lotus is the symbol of purity. Its seeds sprout in the dark and murky bottom of a pond while the beautiful flowers bloom above the surface, unspoiled by the muddy water. The lotus also inspires Yoga, which cleanses your mind, body and soul. While some consider it a very spiritual experience, everybody agrees it's one that's truly incredible.

India Tourism Tokyo
Isei Bldg. 7/8F, 1-8-17 Ginza, Chuo-Ku
Tokyo 104-0061 Tel: 03-3561-0651/52 Fax: 03-3561-0655
Website: http://www/incredibleindia.org

www.incredibleindia.org. contactus@incredibleindia.org

Durga Puja Program October 8, 2011

Puja	... 11:30 AM
Anjali	... 12:30 PM
Prasad & Lunch	... 1:00 PM
Cultural Program	... 3:00 PM
Puja & Arati	... 5:00 PM

Cultural Programme

Devi Vandana	
Song	Tannistha Roychoudhury
Dance	Mohima Kundu
Two skits adapted from Sukumar Roy`s short stories:	
"Hingshuti"	Adrija, Akanksha, Ashmita, Madhumanti, Malini, Maya, Mini, Modhur, Rupkatha, Sneha Directed by Sujata Chowdhury
"Pagla Dashu"	Amartya, Aneek, Arunansu, Manav, Nishant, Ron, Subhankar, Tuhin and Biswanath Ganguly Directed by Rita Kar & Biswanath Ganguly
Tokyo Bangla Band :	Anirvan Mukherjee, Anindya Bhattacharrya, Biswanath Paul, Indranil Nath, Indranil Roychoudhury, Pranesh Kundu, Prantik Chakraborty, Sanjib Chanda, Viswa Ghosh Kaori Izumida (Keyboard) Tannistha Roychoudhury (Guitar)
Japanese Song :	Bhaswati Ghosh, Christine Bannerjee, Debarati Bose, Karabi Mukheerjee, Keiko Chattopadhyay, Meeta Chanda, Mitali Ghose, Rita Kar, Tuli Patra
Odissi Dance:	Kazuko Yasunobu and her group
Baul and Fakiri music:	Baul-Fakirs of Nadia, Visiting group from India
Stage, Light and Sound management	Sanjib Chanda, Biswanath Paul, Prabir Patra, Pranesh Kundu, Santanu Nag, Madhab Ghose, Bharat Vakde, Kaori Izumida, Atsushi Suzuki
Master of Ceremonies	Keiko Chattopadhyay, Sraboni Mukherjee and Brajeswar Bannerjee

Program coordinated by Rita Kar

Venue: Ota Bunkanomori Hall, Ota-ku, Chuo 2-10-1, Tokyo 143-0024, Tel.: 03-3772-0700

© Bengali Association of Tokyo, Japan (BATJ). All rights reserved.
Disclaimer: The articles compiled in this magazine are personal opinion of the authors and in no way represent any opinion of BATJ.

AMBASSADOR OF INDIA
भारत का राजदूत

12 September 2011

MESSAGE

I am happy to understand that this year's Durga Puja is being celebrated by the Indian community as well as their Japanese friends on October 8, 2011.

Durga Puja is regarded as the most important festival of West Bengal and one of the biggest social events of India. Today, it is celebrated not only as a religious festival in India but as an event of cultural and social significance.

I am glad to know that in view of the historical friendship between peoples of India and Japan, an increasing number of Japanese are also participating in the Puja every year which surely is a sign of deepening bond of friendship and mutual understanding between the peoples of the two countries.

I appreciate the efforts of the Durga Puja Celebration Committee, Tokyo in celebrating the 10-day long Festival with enthusiasm and piety and extend my greetings to all members of the Indian community on this festive occasion.

Alok Prasad
(Alok Prasad)

Embassy of India, 2-2-11 Kudan Minami, Chiyoda-ku, Tokyo 102 0074
Telephone : +81-3-3265-5036 Fax : +81-3-3262-2301;Email: pstoambassador@indembjp.org

সম্পাদকীয়

জাপানের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এগারোই মার্চের বিধ্বংসী ভূমিকম্প, ৎসুনামি এবং তার ফলস্বরূপ ফুকুশিমা পারমাণবিক চুল্লীর বিস্ফোরণ ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণ, সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে একটি সত্যের পুনরুদ্ঘাটন করেছে, যা হোল -- কত নশ্বর এই মানবজীবন। এগারোই মার্চ দুপুর দুটো ছেচল্লিশ মিনিটে শুরু হয়েছিল যে প্রলয়কাণ্ড ইতিমধ্যেই তা হনন করেছে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ। ধ্বংস করেছে বিস্তৃত অঞ্চলের জনপদ। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের আতঙ্কের বীজ বপন করে রেখেছে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যেও। সারা পৃথিবীর মানুষ জাপানের এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল।

জাপানের ইতিহাসে অবশ্য এরকম ছোট বড় দুর্যোগের নজীর আরও অনেক। ১৯২৩ সালের কান্তো মহাভূমিকম্প, ১৯৪৫-এ হিরোশিমা নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ এবং ১৯৯৫-এর হানশিন মহাভূমিকম্প এখনও বেদনাদায়ক স্মৃতি। প্রাকৃতিক কারণেই হোক বা মানুষের সৃষ্টি, জাপান বারংবার পরিণত হয়েছে ধ্বংসের লীলাক্ষেত্রে। তবু সেই ধ্বংসস্তুপের উপরে আবার গড়ে তুলেছে উত্তরোত্তর শক্তিশালী সৌধ। ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে চলেছে সেই ভাঙাগড়ার কাহিনী। তাই এগারোই মার্চের ধ্বংসের উপর আবার রচনা হবে নতুন সৃষ্টির ইতিহাস। নিঃসন্দেহে জাপান সম্বন্ধে এই আশা পোষণ করা যায় তার চারিত্রিক বলিষ্ঠতা এবং সচেতন সুশীল সমাজের জন্য।

জাপানি ভাষায় 'গামান' শব্দটির আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ 'সহ্যশক্তি' হলেও, দুটি শব্দের ব্যাপ্তির পার্থক্য আছে। সহ্যশক্তি শব্দটির অর্থ আমাদের ব্যক্তিগত স্তরেই সীমিত। স্বেচ্ছায় জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধভাবে সহ্যশক্তির পরিচয় দেওয়ার দৃষ্টান্ত বহু দেশেই বিরল। এগারোই মার্চের মহাসঙ্কটের পর জাপান ঐক্যবদ্ধভাবে সংকট মোকাবেলার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। একাধিক পারমাণবিক চুল্লী বন্ধ করে দিতে হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি হয়। সরকার এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা থেকে জনসাধারণের কাছে আবেদন জানানো হয় বিদ্যুত ব্যবহারে সংযমী হওয়ার জন্য। গ্রীষ্মে দু তিন মাস ধরে সমষ্টিগত সংযম উৎপাদনের সেই ঘাটতিকে সহজেই মোকাবেলা করতে সক্ষম করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এই সমাধান সম্ভবপর হয়েছে কোনও আইন প্রণয়ন না করেই।

ভূমিকম্পের পর কোনও এক সন্ধ্যায় একটি কনভিনিয়েন্স স্টোরে সারিবেঁধে দাঁড়িয়ে ক্রেতারা জিনিস কেনবার সময় হঠাৎই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তার ফলে চতুর্দিকে অন্ধকার ছাড়াও ক্যাশ রেজিষ্টার বন্ধ হয়ে যায়। দাম মেটানোয় অক্ষম ক্রেতারা বিনা বাক্যব্যয়ে একে একে দোকানের মালিকের কাছে পণ্যদ্রব্য ফেরত দেন এবং অপেক্ষা করেন বিদ্যুৎ ফিরে আসার আশায়। সামাজিক স্তরের এই সততা, নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলী মানুষকে ধর্মের পথে চলতে সাহায্য করে এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্তির পথকে সুগম করে।

ৎসুনামির তোড়ে ভেসে যাওয়া রিকুযেনতাকাতার সমুদ্রতটে আজ দাঁড়িয়ে আছে কেবল মাত্র একটি পাইন গাছ যেখানে একসময় শোভা পেত সত্তর হাজার পাইন গাছ। এই একক গাছটি জাপানীদের কাছে যেমন ভাবে শক্তির প্রতীক, তেমনি ভাবে আশার আলোও।

'অঞ্জলি'র পক্ষ থেকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি জাপান যেন সেই আশার আলোয় বুক বেঁধে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। শোকসন্তপ্ত, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার, যাদের ক্ষতি অপূরণীয় অপরিবর্তনীয়, ঈশ্বরের করুণাধারা যেন তাদের উপর বর্ষিত হয় অবিরাম; ধীরে ধীরে এই তমসার অবসান ঘটে এবং বিশ্ববাসী আবার অনুভব করে

'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'

ওঁ শান্তি ।। ওঁ শান্তি ।। ওঁ শান্তি ।।

Editorial

To the inhabitants of this planet the calamities that struck North East Japan on March 11 with a series of devastating earthquakes and tsunamis, and subsequent radiations from the Fukushima nuclear power plant, once again revealed the transitory nature of human existence. Since 2:46 pm that day thousands of lives have been lost and habitations wiped off. As for nuclear radiation, its effect may extend to the following generations, continuing to endanger life. Justifiably, the event has stirred sympathy elsewhere in the world too.

Since antiquity, however, calamities have visited Japan time and again. They include, for example, the great earthquakes devastating Kanto region in 1923 and Hanshin in 1995. In between, in 1945, the cities of Hiroshima and Nagasaki were very nearly razed to the ground by atom bomb. Whether it is owing to forces of nature or wartime insensibility, the Japanese have had to watch again and again their cities and homes reduce to ruins. However, as history has it on record, they have then, on the same ruins, once again erected edifices, holding aloft their image of invincibility. March 11 earthquake and tsunami ravages also will be replaced in time by evidences of advances. One can trust Japan on this because its citizens can accept a challenge and because they can attend to it without losing their composure.

Though normally supposed to stand for *tolerance* in English, the word *gaman* in Japanese is a quality that is not limited in its connotation to a one characterizing individuals. Japanese men and women patiently facing the March 11 catastrophe have set an example of collective endurance. Closing of the nuclear reactors in succession obviously reduced power supply. Both the government and the power supply companies appealed to the public to manage with less power. An entire nation strove and succeeded by the end of summer to bring the situation largely under control. And this was achieved without any need to introduce legal measures. One evening during the period power went off and plunged an entire city in darkness just when in a convenience store the customers were waiting to pay at the counter. Absence of power turned off the cash register and paralyzed the activities in the store. Without a word the customers returned one by one whatever they had in their shopping carts and waited for power to return. Such honesty and sense of responsibility helps a nation to advance along the path of righteousness and attain God's grace.

Of the seventy thousand pine trees that once stood in all their glory along the seashore in Rikuzentakata, only one remains today after the tsunami, as if signifying Japan's strength and the country's hope for the years ahead.

We pray to God on behalf of *Anjali* that this hope may lead the Japanese ahead ever after. Let the Almighty never cease to shower His blessings on the bereaved families, on those whose losses can in no way be retrieved. Let darkness slowly give way to light and the bliss that pervades our world enliven us.

Om Shanti Om Shanti Om Shanti

Acknowledgements

Unlike other years, it was difficult to pour our hearts in the preparation of Anjali this year. Devastation of March 11 had been in our thoughts persistently. So we initially decided to keep this year's Anjali short and simple – more from a ritualistic perspective. A few enthusiastic friends suggested though, that we should not change overall composition of Anjali, keeping in mind that it has a different purpose too. From the slow pace for few months in the beginning, we had to speed up suddenly. We did not have adequate time for producing a good quality magazine. However, overwhelming support of many people and the matured effort of our team made it possible to bring Anjali to you like every other year.

The Embassy of India in Tokyo extended their gracious support for which we are very thankful. We hope to receive the same patronage in future as well. We would like to thank all advertisers who have sponsored this year's publication. We thank Syamal Kar, and Sanjib Chanda, for their great achievements in collecting advertisements from our sponsors in this year too.

Anjali continues its multi-lingual nature through articles written by native speakers of different languages and various cultural backgrounds from Japan and abroad. We sincerely thank each of them for their support. Karabi Mukherjee, and Hemalatha Anand helped us in proof reading. We are thankful to them. We also thank Shobi Insatsu for their ongoing support in printing Anjali.

At different stages of this process, we received valuable advices from many well wishers. We tried to incorporate their suggestions as much as possible, and convey our sincere thanks to all of them.
Lastly, we would like to appreciate Nishant (Sanjib and Meeta's son), who over time is becoming a valuable contributor in the team.

Editorial Team

Editorial Team

Ranjan Gupta
Ruma Gupta
Sanjib Chanda
Meeta Chanda
Sudeb Chattopadhyay
Keiko Chattopadhyay

Cover Design

Meeta Chanda
Sanjib Chanda

Integration & Design

Sanjib Chanda

(*Recent versions of Anjali magazine are available at BATJ website and Anjali 2011 will also be available later.)*

Contents

Story, Travelogue, Feature, Poetry

রসো বৈ সঃ - স্বামী মেধসানন্দ 8
ঋণী তত করেছ আমায় - শুভা কোকুবো চক্রবর্তী 10
জাপানে ভূমিকম্প - তপন চক্রবর্তী 12
জাপানের ভয়াবহ ১১ই মার্চ ও আমার অভিজ্ঞতা - তানিয়া রায় ভট্টাচার্য্য 14
কেদারনাথ দর্শন - সুপ্রভা কুমার 16
কারুইযাওয়া পরিভ্রমণ - কাজুহিরো ওয়াতানাবে 17
কালিম্পং ও রবীন্দ্রনাথ - তপন কুমার রায় 20
রবীন্দ্রনাথের ছোট কবিতা - কিওকো নিওয়া 22
পুজো, প্রকৃতি ও ঈশ্বর - তিতলি বাসু 23
মোনা লিসা - রুমা গুপ্ত 25
গবেট কোথাকার - গৌতম সরকার 27
ক্ষুদ্দার ব্যাংকক ভ্রমণ - অনুপম গুপ্ত 29
সাকুতারো ও জীবনানন্দের অনুধাবন কাব্য - মাসাইউকি উসুদা 31
লাইট অফ এশিয়া - সীমা ঘোষ 33
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে - ভাস্বতী ঘোষ (সেনগুপ্ত) 34
পূজারিনী - নমিতা চন্দ 34
আন্না আপনাকে - শংকর বসু 35
চাওয়া পাওয়া - শতরূপা ব্যানার্জ্জী 36
শরৎ, তুমি এলে সে তো নেই - পূর্ণিমা ঘোষ 36
লহ প্রণাম - রুমা গুপ্ত 37
আমার স্বামী - কেইকো আজুমা 38
জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে - মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত) 39
আজুমা সেনসেই সম্বন্ধে সামান্য কথা - সেৎসু তোগাওয়া (মাকিনো) 40
খোলা চিঠি - আলপনা ভট্টাচার্য 41
Food for Life Global – JAPAN - Sanjay Karanji 42
Memories - Anirvan Mukherjee 45
Memories of the Towers - Suparna Bose 48
Flashbacks and Spotlights - Sougata Mallik 49
Birds in Kobe - Jyotirmoy Ray 51
It's a Beautiful World - Hemalatha Anand 53
A Story about Fingerprint - Tsuyoshi Nara 54
The Moonlit Night's Dream - Sakuntala Panda 55
The Island of the Gods - Tapan Das 59
U.S. College Admission – Do's and Don'ts - Sanjeev Gupta 62
A Book for All Ages - Rita Kar 63
Virgin Galactic: A Revolution or a Risk? - Shoubhik Pal 64
Home is where the hearth is.... Is it? - Anagha Ramanujam 66
India - The Emerging Global Manufacturing Hub - Arun Goyal 68
Japan's most popular CEO - Ravi Mathur 70
Life I Live I See - Shalini Mallik 71
Charm Of Life - Sunil Sharma 72
Autobiography of a One Rupee Coin - Tanushree Dutta 73
Spectator - Udita Ghosh 74
A Poem for my Daughter - Ahona Gupta 75
जापान से सीख – लोचनी अस्थाना 76
श्री हनुमान चालीसा अनुवाद – रोहन अगरवाल 78

भाग्य का खेल – शुक्ला चौधुरी 82
जापानी गीत – अपने गाँव की याद – सुरेश ऋतुपर्ण 84
मेरा भारत – सुवेता भटनागर 85
छोटी सी बात – ऋतम बतरा 85
नींद की लुका-छिपी – सुमिता भट्टाचार्जी 86
ओ शिक्षित मानव – स्वर्गीय नेमीशरण मित्तल 87
मेरे सपनों में वो बात नहीं होती – अनुराग पाँडेय 88
東日本大震災 本格復旧はこれから – 月野亜佐子 89
初めてのインド – 羽成 千亜希 91
わっこひろば「宙」開園 – 山田 さくら 92
アジアラスベガス—マカオ – クリスティン バナルジ 94
「私はアジア人？」 – シャモント 恵里菜 95
夏の日の便り – 吉田美紀 97

Young budding Stars Section:

The Recess Mess - Mrittika Dutta Gupta, Grade III 98
The Japan Disaster - Madhumanti Chowdhury, Grade III 98
My Summer Holidays - Nishant Chanda, Grade V 99
The Music Box - Aishwarya Kumar, Grade VI 102
My Graduation - Arunansu Patra, Grade VI 105
Earthquake in Japan - Amartya Mukherjee, Grade VII 106
The Haunted Castle Of Oklahoma - Saptarshi Nath, Grade VII 108
Lugalbanda and the Anzu Bird - Akash Dutta Gupta, Grade VIII 111
Khichudi - A New Taste - Tannistha Roychoudhury, Grade IX 112

Drawings 116
Arts 120
Photographs 123

Statement of Accounts 125
Special Thanks 125

রসো বৈ সঃ

- স্বামী মেধসানন্দ

উপনিষদে 'ব্রহ্ম'কে (Supreme Reality) কখনও ইতিবাচক, কখনও নেতিবাচক, কখনও ইতিবাচক--নেতিবাচকের ঊর্দ্ধের এক সত্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্রহ্মের নেতিবাচক বর্ণনা : ব্রহ্ম অসীম, অনাদি, অনন্ত, অরূপ, নির্গুণ, তিনি অবাঙ্‌মনসগোচরম্।

ব্রহ্মের ইতিবাচক বর্ণনা : ব্রহ্ম সৎ-স্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ। সেই বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে যাঁরা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন তাঁরা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হন -- অর্থাৎ সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ, রসস্বরূপ হয়ে যান। একদিকে তাঁদের মধ্যে যেমন জ্ঞানের চরম বিকাশ দেখা যায় তেমনি তাঁদের মধ্যে আনন্দময়তার উজ্জ্বল প্রকাশও দেখা যায়। বর্তমান যুগের দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা এই দুই ভাবেরই সার্থক সমন্বয় দেখি। শ্রীরামকৃষ্ণের এ যাবৎ প্রাপ্ত তিনটি আলোকচিত্রের মধ্যে, যাদের প্রত্যেকটিই সমাধি চিত্র, বিশেষতঃ একটির মধ্যে তাঁর যে দিব্য আনন্দের অমৃতবর্ষী হাসি দেখা যায় -- তা একেবারেই তুলনারহিত। আর আলোকচিত্রে তো বাস্তব অভিব্যক্তির অতি সামান্যই ধরা পড়ে!

শুধু সমাধিস্থ অবস্থায় নয়, চেতনার সাধারণ ভূমিতে অবস্থানকালেও যে শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোচনা করতেন তা নয়। অনেক সময় বিমল হাস্যরসও যে পরিবেশন করতেন তার পরিচয় শ্রীম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-এর পাতায় পাতায় আমরা পাই। কখনও কখনও সে রসের পরিমাণ এত বেশী হয়ে যেত যে তাঁর অল্পবয়সী শিষ্যরা হাসতে হাসতে ক্লান্ত হয়ে তাঁকে মিনতি করতো, "দোহাই আপনার, আর হাসাবেন না। আর হাসতে পারছি না।" 'কথামৃত'-পাঠক শ্রীরামকৃষ্ণকে কেবল শ্রদ্ধাভক্তি করা নয়, তাঁকে যে না ভালোবেসে পারেন না তার কারণ তাঁর বালকবৎ সরলতা ও আনন্দময়তা। এ প্রসঙ্গে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মন্তব্য : 'এমন আনন্দময় পুরুষ আর দেখি নি।' তবে তাঁর রসবোধের এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা সাধারণ রসিকপুরুষের থাকার কথা নয়; সেই বৈশিষ্ট্য হল এই যে সে রসবোধ উৎসারিত হতো এক গভীর উৎস থেকে; আর সেই উৎস হল তাঁর সৎ-চিৎ-আনন্দময়ী কালী তথা ব্রহ্মের উপলব্ধি।

আমরা এখানে 'কথামৃত' থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্যরসের কিছু উদাহরণ তুলে ধরবো।

১৮৮৪ সাল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত অধরলাল চট্টোপাধ্যায়ের কলকাতার আহিরিটোলার বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। অধরলাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ব্রিটিশ আমলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন উপলক্ষ্যে অধরলাল আরও কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি আবার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার সম্পর্ক কিছুক্ষণ ব্যাখ্যা করার পর অধর ও তাঁর বন্ধুরা ইংরাজীতে সে সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সে সব আলোচনা বোধগম্য হচ্ছিল না কারণ তিনি ইংরাজী জানতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ ইংরাজী জানতেন না সেকথা জেনেও তাঁর সামনে ইংরাজীতে কথা বলা সৌজন্য বহির্ভূত। সে বিষয়ে ইঙ্গিত করে শ্রীরামকৃষ্ণের সরস মন্তব্য : একটা কথা মনে পড়ে আমার হাসি পাচ্ছে। শুন একটা গল্প বলি :

'একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। একজন ভদ্রলোককে কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে লোকটি ড্যাম্ (Damn) বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুর-টুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে, তুমি আমায় ড্যাম্ বললে, এর মানে কি, এখন বল। সে লোকটি বললে, আরে তুই কামা না, ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস। নাপিত, সে ছাড়বার নয়। সে বলতে লাগল, ড্যাম্ মানে যদি ভাল হয়, তাহলে আমি ড্যাম্, আর আমার বাপ ড্যাম্, আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম্। (সকলের হাস্য)। আর ড্যাম্ যদি খারাপ হয়, তাহলে তুমি ড্যাম্, তোমার বাবা ড্যাম্, তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম্। (সকলের হাস্য) আর শুধু ড্যাম্ নয়, ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যা ড্যাম্ ড্যাম্।(সকলের উচ্চ হাস্য)।'

শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর প্রসঙ্গে নানাবিধ ব্যাখ্যা শুনে, তাঁর কীর্ত্তন শুনে ও সমাধি দেখে অভিভূত বঙ্কিমচন্দ্র নিবেদন করলেন, 'একটি প্রার্থনা আছে, অনুগ্রহ করে কুটিরে একবার পায়ের ধুলা ----"

শ্রীরামকৃষ্ণ – "তা বেশ তো। ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

বঙ্কিম -- "সেখানেও দেখবেন ভক্ত আছে।"

ভক্ত প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আবার সরস মন্তব্য – "কি গো কি রকম সব ভক্ত সেখানে? যারা গোপাল গোপাল, কেশব কেশব বলেছিল, তাদের মতো কি?" (সকলের হাস্য)।

একজন ভক্ত – "মহাশয়, গোপাল গোপাল ও গল্পটি কি?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) --- "তবে গল্পটি বলি শোন। এক জায়গায় একটি স্যাকরার দোকান আছে। তারা পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, তিলক সেবা, প্রায় হাতে হরিনামের ঝুলি আর মুখে সর্বদাই হরিনাম। সাধু বললেই হয়, তবে পেটের জন্য স্যাকরার কর্ম করা; মাগছেলেদের তো খাওয়াতে হবে। পরম বৈষ্ণব। এই কথা শুনে অনেক খরিদ্দার তাদের দোকানে আসে; কেননা তারা জানে যে, এদের দোকানে সোনা-রূপা গোলমাল হবে না। খরিদ্দার দোকানে গিয়ে দেখে যে, মুখে হরিনাম করছে আর বসে বসে কাজকর্ম করছে।

খরিদ্দার যাই গিয়ে বসল, একজন বলে উঠল, 'কেশব! কেশব! কেশব!' খানিকক্ষণ পরে আরেকজন বলে উঠল,'গোপাল! গোপাল! গোপাল!' আবার একটু কথাবার্তা হতে না হতেই আর একজন বলে উঠল, 'হরি! হরি! হরি!' গয়না গড়বার কথা যখন একরকম ফুরিয়ে এল, তখন আর একজন বলে উঠল, 'হর! হর! হর! হর!' কাজে কাজেই এত ভক্তি প্রেম দেখে তারা স্যাকরাদের কাছে টাকাকড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হল; জানে যে এরা কখনও ঠকাবে না।

কিন্তু কথা কি জানো? খরিদ্দার আসবার পর যে বলেছিল, 'কেশব! কেশব!' তার মানে এই, এরা সব কে? অর্থাৎ যে

খরিদ্দাররা আসলো এরা সব কে ? যে বললে, 'গোপাল ! গোপাল !' তার মানে এই, এরা দেখছি গরুর পাল, গরুর পাল। যে বললে, 'হরি ! হরি !' তার মানে এই, যেকালে দেখছি গরুর পাল, সে স্থলে তবে 'হরি' অর্থাৎ হরণ করি। আর যে বললে, 'হর ! হর !' তার মানে এই যেকালে গরুর পাল দেখছো, সেকালে সর্বস্ব হরণ কর। এই তারা পরম ভক্ত সাধু।" (সকলের হাস্য)।

দিব্য আনন্দময়তার প্রকাশ যে কেবল শ্রীরামকৃষ্ণেরই বৈশিষ্ট্য ছিল তা নয়। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও কমবেশী তা দেখা যেত। যেমন ধরা যাক স্বামী বিবেকানন্দ। কেবলমাত্র স্বামীজীর হাস্যরসকে উপজীব্য করে কয়েক'শ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, যার নাম 'সহাস্য বিবেকানন্দ'। লেখক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারের সময় তাঁর সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দময়তার নিরন্তর প্রকাশ দেখে একজনের সরস প্রশ্ন, "Swami, don't you ever become serious?" স্বামীজীর চট্‌জলদি জবাব : "Yes, when my stomach aches!"

স্বামীজীর 'প্র্যাকটিকাল জোক্'-এর একটি উদাহরণ দিয়ে এ লেখার উপসংহার টানবো।

তার আগে ভূমিকা দরকার। আবাল্য তপস্বিনী গৌরীমা, যিনি কলকাতার সারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী, শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন --যদিও তাঁর ইষ্টদেবতা ছিলেন 'দামোদর' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ -- যাঁকে আদর করে তিনি বলতেন, 'দামু'। দামুকে প্রতিদিন নিষ্ঠাসহকারে ভোগ নিবেদন করা থেকে শুরু করে নানাভাবে তিনি তাঁর সেবা করতেন। বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে তপস্যা করে কাটালেও কখনও কখনও তিনি মায়ের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর মা ছিলেন গিরিবালা দেবী , যিনি সুশিক্ষিতা ও প্রতিভাশালিনী। প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল। গিরিবালা দেবী মেয়েকে তো ভালোবাসতেনই, সেইসঙ্গে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়েকে ভয়ও করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যরা গিরিবালা দেবীকে দিদিমা বলে ডাকতেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার জন্য স্বামীজী তাঁর খুব সুখ্যাতিও করতেন। দুজনের মধ্যে অনেক আলোচনা ও হাস্য-পরিহাসও চলত।

সন্ন্যাস-আশ্রমের প্রসঙ্গে গিরিবালা দেবী রহস্যচ্ছলে বলতেন, "ভারী তো আমার সাধু ! খিড়কি দোর দিয়ে পালিয়েছ, তোমাদের আবার বাহাদুরি কি ? আমাদের মত সংসারের জ্বালা সয়ে যদি ভগবানকে ডাকতে পারতে, বুঝতুম, হ্যাঁ মরদ।" স্বামীজীও হার স্বীকার না করে বলতেন, "দিদিমা, সংসারের মোহ এখনও কাটাতে পারছো না, তোমাদের কি উপায় হবে ?"

একবার গৌরীমা, তাঁর মা, এক সহোদর ও স্বামীজী হরিদ্বারের এক বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। একদিন গৌরীমা বাইরে গেছেন, এমন সময় এক ভিখারী এসে উপস্থিত। গিরিবালা তাকে দেবার মতন ঘরে কিছু পাচ্ছিলেন না। কতকগুলি আম গৌরীমা দামোদরের ভোগের জন্য আলাদা করে রেখেছিলেন। ঠাকুরের উদ্দেশ্যে রাখা কোনও খাবারের অগ্রভাগ ভোগের আগে তিনি কাউকে দিতেন না। গিরিবালা দেবী তা ভালোমত জানতেন। স্বামীজী সেই আমগুলি দেখিয়ে বললেন, "দিদিমা, আম তো রয়েছে কতকগুলো, দুটো ওকে দাও না।" দিদিমা মেয়েকে তো ভালোভাবে জানতেন, বললেন, "আরে বাপ্ রে, এসে একথা জানলে এক্ষুনি প্রলয় ঘটাবে।"

গৌরীমার আচারনিষ্ঠার কথা স্বামীজীও ভালোমত জানতেন, তবু সরলস্বভাব দিদিমাকে নিয়ে রঙ্গ করার জন্য বললেন, "তা বলে গরীব ভিখিরীকে শুধু হাতে ফিরিয়ে দেবে, দিদিমা !" তাঁর কথায় বৃদ্ধা দু-তিনটি আম এনে ভিখারীকে দিলেন।

এদিকে গৌরীমা আসামাত্র, নিতান্ত ভাল মানুষের মতো স্বামীজী তাঁর কাছে দিদিমার আম দেওয়ার ব্যাপারটা বলে দিলেন। সেইসঙ্গে জুড়ে দিলেন তাঁর উদ্বিগ্ন মন্তব্য, "ও গৌরীমা, দেখেছ কাণ্ডটা ! দিদিমা তোমার দামুর ভোগের ঐ আম ভিখিরীকে দিয়ে দিয়েছে। দামুর ভোগ তো ওতে আর হবে না।" এই কথা শুনে গৌরীমা মায়ের ওপর খুব অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকলেন।

তাঁরই দোষে দামোদরের ভোগ নষ্ট হয়েছে, বৃদ্ধা সেজন্য মেয়ের কোনও কথার প্রতিবাদ করলেন না। কিন্তু স্বামীজীর আচরণে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে স্বামীজী মনে মনে খুব কৌতুক বোধ করছিলেন। তারপর একসময় গিরিবালা দেবীকে নিরালায় পেয়ে ছদ্ম সহানুভূতির সঙ্গে বলতে থাকলেন, "দেখলে তো দিদিমা, তোমার মেয়ের কাণ্ডটা ! সামান্য দুটো আমের জন্যে তোমাকে কি বকাটাই না বকলে।"

দুঃখের মধ্যে দিদিমা হেসে বললেন, "তা দাদা, তুমিও তো ঠাকুরটি কম নও ! চোরকে বলো চুরি করতে, গেরস্তকে বলো সজাগ থাকতে।"

তখন দুজনেই খুব হাসতে থাকলেন।

হাসির উৎস আনন্দ। আনন্দের তথা রসের উৎস ব্রহ্ম। তাই উপনিষদে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে 'রসো বৈ সঃ'।

তথ্যসূত্র :

১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত -- অখণ্ড সংস্করণ (পৃঃ ১২১০ --১২১৯) উদ্বোধন কার্য্যালয়, ৩রা জুলাই ১৯৯০।

২) গৌরীমা -- শ্রীদুর্গাপুরী দেবী পৃঃ ১৬৭-১৬৮ শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

ঋণী তত করেছ আমায়

- শুভা কোকুবো চক্রবর্তী

মার্কিন অভিনেতা-কমেডিয়ান Gilbert Gottfried-এর একটা joke--- 'জাপানীদের বীচে যেতে হয়না স্নান করতে, সমুদ্রই তাদের কাছে আসে', পড়ে আঁৎকে উঠি। এ কেমন অমানবিক রসিকতা !

গত ১১ই মার্চ উত্তরপূর্ব জাপানের ম্যাগনিচুড ৯.০র ভূমিকম্প আর ভয়ংকর ৎসুনামি সমস্ত জাপানবাসীকে স্তব্ধ করে দিল। ভেসে গেল হাজার হাজার প্রাণ আর যারা রইল তাদের কেউ না কেউ নিখোঁজ। মা আছেন তো বাবা নেই। কোথাও বা উল্টো। মা-বাবা আছেন তো বাচ্চা নেই। কোথাও আবার পুরো পরিবারটাই গেছে ভেসে। বাড়ির পোষা কুকুরটা ভাঙাচোরা কাঠের জঞ্জালের পাশে থরথর করে কাঁপে রক্তাক্ত-কাদামাখা গায়ে। ত্রাণশিবিরগুলোতে জল নেই, খাবার নেই, আলো নেই, ঐ ঠাণ্ডায় কম্বল নেই। ফাটলধরা-ভাঙা পথে কেরোসিন আনা যাচ্ছেনা আর তাই হিটার জ্বালানোতেও চলছে রেশনিং। সঙ্গে শুরু হয় নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর বিস্ফোরণ। জাপানবাসীদের দিন কাটে আতঙ্কের মধ্যে।

তারই পাশাপাশি ত্রাণশিবিরে নতুন প্রাণের জন্ম হয়। দাদু আদর করে নাম দেন আকি। আই (ভালবাসা)-এর 'আ' আর কিবো (আশা)র 'কি'। এই দুটো অক্ষর নিয়ে আকি। ছোট্ট তিন দিনের প্রাণটা হাই তোলে, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে কাঁদে। আশেপাশের নিস্তেজ মানুষগুলোর মনে বাঁচার ইচ্ছে জাগে নতুন করে।

সেন্দাই এবং ফুকুশিমাতে অনুষ্ঠানের সুবাদে গিয়েছিলাম কয়েকবছর আগে। যে কোনো জায়গাতেই অনুষ্ঠান করতে গেলে সেই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যারা জড়িত প্রথমে তাদের সঙ্গে পরিচিতি হয়, তারপর আস্তে আস্তে বন্ধুত্ব, এমনকি আত্মীয়তাতেও পৌঁছয়। পরপর ফোন করতে থাকি। কিছুতেই কানেক্ট করতে পারি না। ছট্‌ফট করতে থাকি। চারদিনের মাথায় যোগাযোগ হয়।

কেমন আছো তোমরা ?

ত্রাণশিবিরে আছি, ঠিক আছি।

খাবার-দাবার ?

একটু অসুবিধে হচ্ছে, তবে সবারই অসুবিধে। সেটা ভাবলে অসুবিধেটা আর অসুবিধে বলে মনে হয়না।

খবর পাই জুন (আমার কত্তা)-এর এক বন্ধুর দোতলা বাড়ির একতলার ছাদ ছুঁই ছুঁই জল। কোনোরকমে দুই মেয়েকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দোতলাতে দিন কাটাচ্ছে।

ভাবি, এই দুঃসময়ে একটু যদি ওদের পাশে গিয়ে ওদের সঙ্গী হতে পারতাম। যদিও প্রায়ই খবরে দেখছি, যে বা যারাই ওখানে একটু সান্ত্বনা দিতে গেছেন, উল্টে তারাই সান্ত্বনা পেয়ে ফিরে এসেছেন। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে যুঝতে কে যেন যুগিয়ে দেয় অসীম মনোবল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল গত বছর থেকেই। একটা বাগানবাড়ি বুক করা হয়েছে। রিহার্সাল চলছে যথারীতি। এরমধ্যেই এই ৎসুনামি। অনুষ্ঠানের কাঠামোটাকে কিছুটা পাল্টে ফেলি তাড়াতাড়ি। টিকিট সেল করে যে অনুষ্ঠানের কথা ভেবেছিলাম সেটাকে করে দি ফ্রি। চ্যারিটি অনুষ্ঠানে Donation Box রাখি। নীরবতা পালনের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। শ্রদ্ধেয় সন্দীপ ঠাকুর স্বত্ত্রীক (আমাদের প্রিয় সন্দীপদা - এইকো বৌদি) সুদূর ওসাকা থেকে আমাদের আমন্ত্রণে উপস্থিত থাকেন। একদিকে খোলা আকাশ, অন্যদিকে বিভিন্ন গাছগাছালি আর আছে নাম-না-জানা একাধিক পাখীর ডাক। এককথায় নাগোয়ার শান্তিনিকেতন। আবহাওয়াও সেদিন আমাদের সঙ্গে বিট্রে করেনি। ১১ই মার্চের ঘটনার পর কিছু গান-নাচেরও পরিবর্তন করি। 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে ---' গানের সঙ্গে ঠিক সেদিন আর নাচতে ইচ্ছে হয়না। বরং 'বেদন বাঁশী উঠলো বেজে বাতাসে বাতাসে ----' গানটা অনেক বেশী তাৎপর্য্যপূর্ণ মনে হয় ভয়ঙ্কর ৎসুনামির ঠিক দুমাস পরের ঐ সন্ধ্যেটাতে। অনুষ্ঠান শেষে দর্শকেরা যে যার সামর্থ্য মতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, আমাদের Donation Boxটাও ভরে ওঠে।

এই অনুষ্ঠানের তোড়জোড় করার সঙ্গে সঙ্গেই যোগাযোগ চালিয়ে যাই সেন্দাই অঞ্চলের সঙ্গে। ঠিক হয় শিচিগাহামা গ্রামের দুটো স্কুলের বাচ্চাদের সঙ্গে কয়েক ঘন্টা করে কাটিয়ে আসবো। নাচ-গান-বাজনা, হৈ-হৈ-আনন্দ দিয়ে ওদের মনের ক্ষত যদি কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়ে দিতে পারি। ফোনে, ই-মেলে বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় জিনিষের কথা জানতে চাইলে 'আপনারা আসবেন অত দূর থেকে, আমরা-বাচ্চারা তাতেই খুশি', জানায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। ঐ দুর্ঘটনার পর কেটে গেল তিনটে মাস। মার্চের ঠাণ্ডায় কম্বলের চাহিদা, বর্ষায় ছাতা, রেইনকোট, গামবুটে গিয়ে দাঁড়ায়। আর এখন তো গরমকাল। ইন্টারনেটে ওখানকার বিস্তারিত খবরাখবর পড়ি প্রায় রোজদিনই। ৎসুনামিতে বাড়ি-ঘর উল্টেপাল্টে যে জঞ্জাল হয়েছে জাপান সরকার সেদিকে চোখ না দিয়ে প্রথমে ত্রাণশিবিরের মানুষজনকে অস্থায়ী বাসস্থানে (kasetsu juutaku) সরাবার সঙ্কল্প নিয়েছেন। ফলে এই গরমে ওখানে মশা-মাছি, পোকা-মাকড়ের উপদ্রব বাড়ছে। আমার ট্রুপ-মেম্বারদের সঙ্গে পরামর্শ করে বাচ্চাদের জন্য মশা-মাছির প্রতিষেধক স্টিকার (mushiyoke shiiru) কিনি। বিভিন্ন ক্যারেকটার (পিকাচু, কিটি, আংপাংমাং) ছাপানো ছোট ছোট রুমাল কেনা হয়। আর কিশিমেনপাই। এটা নাগোয়ার কয়েকটা নামকরা খাবারের একটা। প্যাকেট না খুললে ২/৩ মাস রেখে খেলেও নষ্ট হয় না। ভয়ঙ্কর ৎসুনামির ঠিক চার মাস পূর্ণ হবার দিনটা ১১ই জুলাই। ঐ দিনই আমরা যাবো বাচ্চাদের স্কুলে। জিনিষপত্র নিয়ে রওনা হই ১০ই জুলাই বিকেল নাগাদ।

গাড়ীতে প্রায় ১০/১১ ঘন্টার পথ পেরিয়ে সেন্দাই টোল-গেট

থেকে বেড়িয়েই চোখে পড়ে ভাঙাচোরা দোকানের কোনোটাতে ব্লু-শীট লাগিয়ে বেচাকেনা চলছে । বেশীরভাগ দোকানপাটই বন্ধ । এমনকি সকালে একটু চা-কফির জন্য এদিকসেদিক ঘুরেও একটা কফিশপ পেলাম না । মেইন রাস্তা থেকে গাড়ি ছুটতে থাকে শিচিগাহামার দিকে । যতই সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছি নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ততই কমছে । গলা বন্ধ হওয়া দৃশ্য চারদিকে । ধানক্ষেতের ওপর কোন এক বাড়ির দোতলার অংশটা । এদিক সেদিক গাড়ি উল্টেপাল্টে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে । দুটো স্কুলের

প্রথমটাতে যেতে হবে সকাল দশটায় । তাই তার আগে ঘুরে ঘুরে দেখি বিভিন্ন জায়গা । ওখানে কোকুসাই মুরা (international village)তে যাই । এখানেই ত্রাণশিবির হয়েছিল । দু সপ্তাহ হোল সবাই যার যার ছোট ছোট অস্থায়ী বাসস্থানে শিফট্ করেছেন । সেখানে জুনের সেই বন্ধু আসেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে, আমাদের একটা জায়গায় নিয়ে গেলেন । জায়গাটা সমুদ্রের কাছে, কিন্তু একটু উঁচুতে । ওখান থেকে চারদিকটা পরিষ্কার দেখা যায় । ওখানে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, সারা শরীর দিয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা

স্রোত বয়ে গেল । মনে হোল মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ দেখছি । জমিগুলো আছে, দেখলে বোঝা যায় এক একটা বাড়ির গন্ডি । অথচ বাড়িটা নেই । ৎসুনামি একেবারে উপ্‌ড়ে নিয়ে গেছে । খাঁ-খাঁ করা পরিবেশ । কিন্তু তার মধ্যেই রাস্তা সারানোর, জলের পাইপ সারানোর কাজ চলছে এদিক ওদিক ।

মন শক্ত করে নির্দ্দিষ্ট সময়ের আধঘন্টা আগে স্কুলে পৌঁছে যাই । ওখানে আমার আরও দুই ছাত্রী মিট করে । গিয়ে বসি টিচার্স রুমে । ঠিক দশটায় দো-তলার হলঘরে ঢুকতেই দেখি প্রায় ১৩০ জন বাচ্চা সুন্দর লাইন করে দাঁড়িয়ে । সঙ্গে শিক্ষিকারাও রয়েছেন । আর একদম পেছনে কয়েকজন প্যারেন্টস্ ।

সঙ্গে করে প্রত্যেকের জন্য ছোট ছোট লাল টিপ নিয়ে গিয়েছিলাম । সবার কপালে পরিয়ে দিই, শিক্ষিকারাও বাদ যান না । ছোট ছোট ফুলের মত শিশুগুলোর কপালে লাল লাল টিপ --- কী যে সুন্দর দেখাচ্ছিল ! নাচ, গান, হৈ-হৈ, হাসি, খেলা, গল্প করে

সময় কেটে যায় চট্ করে । ফেরার পালা । বাচ্চাগুলো আবার সেই আগের মত করে লাইন করে আমাদের বিদায় জানায় । আমরা সকালে স্কুলে পৌঁছেই স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে জিনিষগুলো তুলে দিয়েছিলাম । ওনারা ওগুলো আমাদের হাতে দিয়ে অনুরোধ করেন বাচ্চাদের হাতে তুলে দিতে । সামান্য কটা জিনিষ বাচ্চাদের হাতে দিয়ে বিদায় জানিয়ে নেমে আসি একতলায় । গাড়িতে উঠতে গিয়ে জোরালো গলায় 'আরিগাতো গোzআইমাশিতা' শুনে পেছন ফিরে দেখি, বাচ্চাগুলো কেউ কেউ দোতলা থেকে, কেউ কেউ আবার নীচের বাউণ্ডারি রেলিঙের ওপাশ থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে । আমরা হাত নেড়ে রওনা দেই পরের স্কুলের উদ্দেশ্যে । এখানেও একইরকম সব কিছু । ফেরার সময় বাচ্চারা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বারান্দায় এসে কোমর অবধি মাথা নামিয়ে ধন্যবাদ জানায় । আমরা প্রতি-নমস্কার জানিয়ে গাড়ির দিকে পা বাড়াই ।

জানিনা ওদের কতটা আনন্দ দিতে পারলাম । এই ধন্যবাদ পাবার সত্যি উপযুক্ত কিনা আমি বা আমরা । কিন্তু আমার পাওয়া হোল অনেকটা । আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা-ভালবাসা-কৃতজ্ঞতা রইল সব্বার জন্য ।

'তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান, গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায় ------ ' বিশ্বকবির এই লাইনদুটো আওড়াই নিজের মনে মনে ।

জাপানে ভূমিকম্প

- তপন চক্রবর্তী

জাপানে ভূমিকম্প কোনও 'কৈলাশে কেলেঙ্কারী' বা 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'এর মত অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে কথায় বলে বিপদে পড়লে লোক চেনা যায়। জাপানে ভূমিকম্পের পর কিভাবে লোক চিনলাম, বরঞ্চ তার কথাই বলি।

১১ই মার্চের দুপুর দুটো ছেচল্লিশ -- আমি তখন আমার ইয়োকোহামার সাতাশ তলার অফিসে। ভূমিকম্প জাপানে মাঝে মাঝেই হয়, তাই প্রথমে গা করিনি । তার পরে যখন বুঝলাম এটা অন্য রকম, বুকের মধ্যেটা ধক্ করে উঠল। সম্বিৎ ফিরতে দেখি দু হাতে টেবিল না ধরে থাকলে এক জায়গায় বসে থাকা যাচ্ছে না। হাঁটতে গেলে পড়ে যাচ্ছে সবাই, আর চারদিকে উড়ন্ত চেয়ার আর ফাইলিং ক্যাবিনেটের ধাক্কাধাক্কির আওয়াজ। আমার ওয়েস্টার্ন সহকর্মীদের দেখলাম , সব মুখ চুন, যে যার বাড়িতে ফোন করছে, যেন এই শেষ ফোন কল। শোভনা তখন পারথ্-এ। আমি ওকে ই-মেল করার চেষ্টা করলুম, 'একটা ভীষণ ভূমিকম্প হচ্ছে এখানে, এখনও চলছে।' ও উত্তর দিল 'আমি এখন খুব ব্যস্ত। এই সাবমিশনটা আজ শেষ না করলেই নয়। বিকেলে কথা হবে।' জাপানে ভূমিকম্প প্রায়ই হয় এবং ও তা দেখেছে দু বছর। কাজই ওই খবর শুনে সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই ওর হাতে। চারদিকে তাকিয়ে দেখি আমার জাপানি সহকর্মীরা কিন্তু বেশ স্বাভাবিক। দুজন তো এক হাতে টেবিল আর অন্য হাতে চেয়ার ধরে নির্বিকার মিটিং করে গেল। বাকিরা দেখলুম বেশ স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের মধ্যে গল্প করছে, আর আমাদের মতো কিছু বিদেশীকে ভরসা দেবার চেষ্টা করছে। খানিক বাদে জানলাম যে ট্রেন চলবে না, যারা তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে চায় যেতে পারে। লিফ্টও চলবে না। আমাদের বিল্ডিংএ আট-দশ হাজার লোক কাজ করে। ভাবলাম সাতাশ তলা থেকে নামতে হবে, সিঁড়িতে স্ট্যামপিড না হয়। আমরা তিন বিদেশী ঠিক করলাম ভিড় হবার আগেই বেরিয়ে যাওয়া উচিত। সিঁড়িতে গিয়ে দেখি তেমন কোন ভিড় নেই। সবাই বেশ এক লাইন করেই নামছে। আর আগেভাগে পালানোর দলে বেশীর ভাগই বিদেশী । ওদিকে ভূমিকম্পের আফটার-শক্ লাগাতার চলছে। বাইরে বেরিয়ে একটু নিরাপদ মনে হোল। তখন মনে পড়লো বাকিদের কথা। ওরা কিভাবে বাড়ি ফিরবে ? আমার বাড়ি অফিস থেকে দশ মিনিট হেঁটে। বাড়ি এসে একটা ই-মেল করলাম, কেউ যদি আমার এখানে এসে থাকতে চায়, চার-পাঁচ জনকে রাখতে পারি। ততক্ষণে বোধহয় সবাই বেরিয়ে পড়েছে। সেদিন রাতে অনেকেই পাঁচ/ছয় ঘন্টা হেঁটে বাড়ি গেছে। অনেকে রাতটা অফিসেই কাটিয়েছে। রাস্তায় দেখলাম কাতারে কাতারে লোক ইয়োকোহামা স্টেশন থেকে কনভেশন সেন্টারের দিকে যাচ্ছে। ট্রেন বন্ধ, ওখানেই রাতটা থাকবে। ইয়োকোহামার কনভেনশন সেন্টার বেশ বড়সড় ব্যাপার। ক'দিন আগে এশিয়া-প্যাসিফিক কনফারেন্স হয়ে গেছে এখানে। আমার এ্যাপার্টমেন্ট এর পেছনে, বারান্দা থেকে দেখা যায়। বেশ কয়েক হাজার লোক ছিল ওখানে সেই দিন রাতে। আমি নিজে কিছু করতে পারিনি বলে মনটা খুব খারাপই লাগছিল। পর দিন সকালে ট্রেন চালু হতে দেখলাম দলে দলে লোক চলে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে আসতে শুরু করলো বিধ্বংসী ৎসুনামি আর পরমাণু দুর্ঘটনার খবর। মর্মান্তিক খবর সব, তা তো তোমরা শুনেছো। এদেশে দু বছরের ওপর আছি। এতদিনে মোটামুটি চিনতেও আরম্ভ করেছি এদের , বেশ ভালবাসতে শুরু করেছি এদেশের লোকেদের। ফুকুশিমা , সেন্দাই অঞ্চলে বেড়াতেও গেছি কয়েক মাস আগে। কি সুন্দর ব্যবহার সেখানকার লোকেদের ! বার বার মনে হয় ভাল লোকগুলোকেই কেন কষ্ট দেয় ভগবান।

এর পর শনি রবি দু দিন ছুটি। সোমবার অফিসে গিয়ে দেখি সব বিদেশীদের এখান থেকে চলে যাবার যেন একটা হিড়িক পড়ে গেছে। কারুর ভূমিকম্পে ভয়, কারুর বা রেডিয়েশনের ভয়। সব্বাই টিকিটের জন্য ফোন করছে, আর জাপানীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে তাদের সাহায্য করার।

আমার মধ্যে ভয় ব্যাপারটা ঠিক ঢোকেনি। এর আগেও একবার ৎসুনামি ওয়ার্নিং শুনে ক্যামেরা নিয়ে পুলিশের বেড়া টপ্‌কে সমুদ্রের ধারে ৎসুনামির ছবি তুলতে গিয়েছিলাম। এখানে থেকে পালানোর চিন্তাটা আমার ঠিক মনে ধরছিল না। বন্ধুদের লিখলাম, 'নিচের জমি তো প্রত্যেক আধ ঘন্টা বাদে বাদেই কাঁপছে। বলতো কি করি ? মন বলছে, জীবন তো এক্সপিরিয়েন্স করার জন্যই , তা সে আনন্দই হোক বা দুঃখ কষ্ট, সবই তো অভিজ্ঞতা। স্রষ্টা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন নিজেকে এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য। একটা সম্ভাব্য দুর্ঘটনার সম্ভাবনাই তো বিরাট অভিজ্ঞতা অর্জনের সব থেকে বড় সুযোগ। এই ধর মাউন্ট ফুজির আগ্নেয়গিরি, ১৭০৭ এ শেষ বার সেখানে অগ্নুৎপাত হয়। এবার নাকি আবার হতে পারে। এসব ছেড়ে আমি কিনা পারথ্-এ গিয়ে শুয়ে শুয়ে আঙ্গুল চুষবো ! এমন সুযোগ কি ছাড়া উচিৎ ?'

উত্তর পেলাম অনেকের কাছ থেকেই। এই ক'দিনে এখানে আর পারথ্এ ই-মেল, ফোন, স্কাইপ আর লিঙ্কডইন সব মিলিয়ে এত লোক যোগাযোগ করেছে, যা দেখে আন্দাজ পাওয়া গেল আমি সত্যি সত্যিই মারা গেলে পৃথিবীতে কত লোক তার জন্যে কষ্ট পাবে ! অনেকে আবার নিজের নিজের পছন্দ মতন দেবদেবীর কাছে গিয়ে আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে এলো। দক্ষিনেশ্বরের মা কালী থেকে শুরু করে নানান দেবদেবী ও গুরুজীরা আমার কল্যাণের জন্য আর্জি শুনলেন। মনে মনে বললাম, 'আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, এমন জোরসে করো যেন ৯ ম্যাগ্নিচিউডের ভূমিকম্পকেও টেক্কা দিতে পারে।'

আমার ছোটভাই কলকাতায় একটা সংস্থা চালায়। সবার ওপর হম্বিতম্বি করে, শুধু আমাকে ছেড়ে। সবার আগে ওই কিন্তু আমার খোঁজ করেছিল। ভূমিকম্প তখনও চলছে। গম্ভীরভাবে বললো, "সবই তো বুঝলাম, কিন্তু টিভি আর ইন্টারনেটে খবর শুনলে মনে হয় তোমার ওখান থেকে পালানোই উচিৎ।"

আমার দিদিও কলকাতায়, আমার থেকে ১২ -- ১৩ বছরের

বড় । আমাকে বলতে গেলে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে । প্রথম একটু হাল্কা উপদেশ,

'য পলায়তি স জীবতি ।' তার পরেরটা পরে বলছি ।

বন্ধুদের উপদেশ মোটামুটি পালানোর পক্ষেই । পারথ্ থেকে ভগিনীতুল্য বন্ধুর স্কাইপ, "তপন দা, ওখান থেকে পালিয়ে এসো ।" অন্যদের এক এক জনের এক এক রকম যুক্তি,

-- ত্রাণ কাজে যোগ দাও না কেন ?

-- আমার তো মনে হয় সুস্বাস্থ্য আর জীবনই সব থেকে মূল্যবান, পালাও ।

-- শোভনা আর ছেলেদের কথা ভাবো । পাগলামি ছাড়ো, উপায় যখন আছে পালাও । দু-এক সপ্তাহ বাদে অবস্থা বুঝে না হয় ফেরত যেও ।

-- তুমি তো কোনও কম্পানীর চেয়ারম্যান নও বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফির ফটোগ্রাফার নও যে এই ঝুঁকি নিতে হবে । পারথ্এ ক'দিনের ছুটি কাটানোই যুক্তিযুক্ত ।

-- কখনও কখনও যুদ্ধ ছেড়ে পালানোই যুদ্ধ জেতার সবথেকে ভাল পন্থা । প্রাণে বাঁচলে যুদ্ধ পরে জেতা যাবে ।

একজন আবার আমার মনের দ্বন্দ্বটা একটু বুঝে বললো, "এখানে ভাবতে হবে আমি না আমরা, কোনটা বড় । অনেক সময় আমরা ছেড়ে শুধু আমি ভাবলে পরে মনস্তাপে ভুগতে হতে পারে । এমন করো যাতে ভবিষ্যতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পার ।"

এর মধ্যে যাব কি যাব না ভাবতে ভাবতে দু-এক দিন কেটে গেছে । ওদিকে দুনিয়ার টিভি চ্যানেলে অবিরাম এখানকার ৎসুনামি আর রেডিয়েশনের খবর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা হচ্ছে । শেষে দিদির আল্টিমেটাম, "ওখানে বসে বসে কাব্যি করতে হবে না । আমার খুব চিন্তা হচ্ছে । সোজা শোভনার কাছে পারথ্এ চলে যাও ।"

অগত্যা ---

দু সপ্তাহ পারথ্এ কাটিয়ে ফিরে এসে দেখলাম, অবস্থা মোটামুটি ফিরেছে । জাপান সেই রামরাজ্যই আছে, তবে মানসিকতাটা কেমন সেই সীতার বনবাসের পর অযোধ্যার মত, চাকচিক্যহীন, একটা গভীর ব্যথা । আর মজার কথা, জাপানিরা আগে বিদেশীদের দেখলে যেখানে "গাইজিন" বলতো, এখন উড়ে যাওয়া বিদেশীদর নাম পাল্টে "ফ্লাইজিন" বলে অভিহিত করছে ।

জাপানিদেরও আরও ভাল করে চেনা গেল অবশ্য এর পরবর্তী সময়ে । এমনিতেই জাপানিদের দেখে একটা কথাই আমার মনে হয় , 'এলিগেন্স' । ওদের চেহারার গড়ন ও হাঁটাচলা দেখলে একটা রাজহাঁসের মত এলিগেন্স সহজেই চোখে পড়ে । এদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রুচিবোধ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না । ব্যবহার খুব মার্জিত, অথচ সহজ এবং স্বাভাবিক । 'এলিগেন্সে'র কোনও বাংলা হয় না -- অন্তত এক কথায় । 'গুগল' অভিধানে 'এলিগেন্সে'র মানে বলা হয়েছে -- সুরুচিপূর্ণতা, সৌষ্ঠব, পরিচ্ছন্নতা, মার্জিত ভাব, বেশভূষায় আড়ম্বর , সৌন্দর্য, চমৎকারিত্ব, শোভা, কমনীয়তা, চারুতা, লালিত্য, চারুত্ব । আর একটা মানে হোল 'পারফেক্সান' বা যে কোনও কাজই নিখুঁত ভাবে করা । বোধহয় এটাই এদের সবথেকে বড় গুণ ।

এ সম্পর্কে একটা গল্প বলি । যখন এক আমেরিকান কম্পানী জাপানের সনি কম্পানীকে মাইক্রোচিপের অর্ডার দেয় , স্পেসিফিকেশন ছিল প্রতি দশ লক্ষ পিসের মধ্যে তিনটির বেশী যেন খারাপ না বেরোয় । জাপানি কম্পানী তিনটি খারাপ পিস একটি আলাদা প্যাকেটে পাঠিয়ে দিয়ে বলে যে ওদের পাঠানো মাইক্রোচিপসে কোনও খারাপ পিস নেই, তাই এগুলো আলাদা পাঠানো হোল । নিখুঁত কাজ করার এই রকম অভ্যাস এদের ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় । তা সে সনির চেয়ারম্যান হোক বা আমাদের ঘর পরিস্কার করার সাধারণ মেইড, পারফেক্সান এদের মজ্জায় মজ্জায় ।

জাপানি মার্শাল আর্টে এই মনোভাব গড়ে তুলতে শেখানো হয় । কঠিন শারীরিক পরিশ্রম ও সংযমের ফল এই মনোভাব । আমাদের দেশের যোগ-ব্যায়াম শিক্ষাও মোটামুটি এই রকম । যখন দেহ আর মন পুরোপুরি সমন্বিত হয়, যখন জীবনী শক্তি সমস্ত ধমনী দিয়ে বাধাহীনভাবে বইতে শুরু করে, তখন একজনের মনোভাব এই 'এলিগেন্স'এর রূপ নেয় । এলিগেন্স শুধু কোনও বাহ্যিক রূপ বা সাজ-পোশাক নয়, কোনও বয়সেরও সীমাবদ্ধতা নেই, এলিগেন্স একটা বিকশিত মনোভাব । যেন একটা সুগন্ধ যা একজনের পারিপার্শ্বিককে ভরিয়ে তোলে সৌরভে । লনজিন্স ঘড়ির জন্য আইশ্বারিয়া রাইএর বিজ্ঞাপন 'এলিগেন্স ইজ এ্যান এ্যাটিচিউড' এর মানে পুরোপুরি উপলব্ধি করলাম কিন্তু এদেরই দেখে ।

এই সব কটা গুণ যে জাপানিদের মধ্যে অন্য সময় থাকে না তা নয়, তবে আরও বেশী করে যেন লক্ষ্য করলাম এই দুর্যোগের সময়, তা সে ওদের স্বভাবের স্বাভাবিক মাধুর্যেই হোক বা নিয়মনিষ্ঠায় । এসবের হাজার হাজার নির্দর্শন গ্লোবাল মিডিয়াতে ফলাও করে দেখানো হয়েছে । এ সব তো তোমরা দেখেছোই । এক সহকর্মীকে বললাম, "সারা পৃথিবীর লোকজন জাপানিদের খুব সুখ্যাতি করছে ।" সে উত্তর দিল, "ওদের কাছে নতুন, তাই করছে । আমরা তো আগে থেকেই জানি । কেন তুমি দেখনি ?" অস্বীকার করতে পারলাম না । এদের সমাজ যেন একটা বড় যৌথ পরিবার । সবাই যেন এদের নিজের ভাই-বোন, আর আমার মত বিদেশীকে এদের বৃহত্তর পরিবারের একজন করে নিতে কোনও দ্বিধা নেই ।

টিভিতে যখন দেখেছি ৎসুনামির ঢেউ বড় বড় বাড়ি, গাড়ী, রাস্তা এবং হাজার হাজার মানুষকে মুহূর্তে গিলে নিল, তখন মনে হয়েছে এই চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামনে মানুষ কতই না অসহায়, জীবন কতই না অনিশ্চিত । তার পর পরবর্তী কয়েক দিনে যখন উদ্ধার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে, আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখেছি এদের শান্ত স্থির আচরণ, অথচ দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ সংকল্প, সমষ্টিগত শক্তিমত্তা, এমনকি বাধার দ্বারা রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা যা প্রমাণ করে সবার উপরে মানুষই কিন্তু জয়ী ।

শতকরা ৮৭ % সম্ভাব্যতা যে ৩০ বছরের মধ্যে এই টোকিওর কাছেই আবার হয়তো একটা ভীষণ ভূমিকম্প হবে এবং তাতে হয়তো আবার তিরিশ চল্লিশ হাজার জীবনহানি হতে পারে । এর পরিপ্রেক্ষিতে টোকিও শহরের নিকটস্থ পারমাণবিক কেন্দ্র সম্প্রতি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । এখানকার বাড়ি, রাস্তা এসব এমনিতেই ভূমিকম্পের কথা মনে রেখেই নির্মিত । এ ছাড়া কিন্তু জীবন চলছে তার নিজের তালে, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ ।

আশা নিয়েই তো জীবন, আর এই জাতীয় জীবনে আশা রাখার মত অনেক কিছুই আছে ।

জাপানের ভয়াবহ ১১ই মার্চ ও আমার অভিজ্ঞতা

- তানিয়া রায় ভট্টাচার্য্য

জাপানের ভয়াবহ ১১ই মার্চ -- দিনটির কথা আমি আর আলাদা করে কী বলবো। আপনারা সবাই এই বহু আলোচিত দিনটির বিবিধ বর্ণনা টিভিতে, সংবাদপত্রে, ইন্টারনেটে বহুবার দেখেছেন বা পড়েছেন। তবুও এবার 'অঞ্জলির' লেখার বিষয় নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনে হল, ১১ই মার্চ ২০১১ দিনটিতে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটির কথাই আপনাদের শোনাব এ বছর।

আমি জাপানের ইয়োকোহামাতে থাকি। ঘটনার সময় অর্থাৎ ১১ই মার্চ ২০১১, দুপুর দুটো ছেচল্লিশ মিনিটে আমি ছিলাম ইউনাইটেড নেশানস্ ইউনিভার্সিটির অফিসে। এই অফিস ইয়োকোহামা পোর্টের ঠিক পাশেই 'সাকুরাগিচো' অঞ্চলে। আমি আর আমার সহকর্মী আব্দুল তখন সবেমাত্র লাঞ্চ সেরে ছ'তলায় আমাদের অফিসে ঢুকেছি। হঠাৎ দুলতে শুরু করল দেওয়াল, ছাদ আর মেঝে।

জাপানে এটা বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার। মাঝে মাঝেই আমরা এরকম মৃদুমন্দ ঈষৎ দ্রুতবেগের দোলানী উপভোগ করে থাকি। তাই প্রথমে বিশেষ পাত্তা দিইনি ব্যাপারটাকে কিন্তু কম্পন ক্রমশ তীব্র হতে থাকল। থামার কোনো লক্ষণ নেই। মাথার ওপর কাঁচের শেড্‌টা ভয়ঙ্করভাবে দুলছে। ভেঙে পড়বে নাকি ! আফগান ছেলে আব্দুল তো তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। করিডোরে তাকিয়ে দেখি জাপানী সহকর্মীরা সকলেই সিঁড়ির দিকে ছুটছে। সারা জীবনে এত তীব্র কম্পন ওরাও নাকি কখনো দেখেনি। আমিও এবার আর দেরী না করে ওদের পিছনে ছুটতে শুরু করলাম। করিডোর দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম বইএর র‍্যাকগুলো উল্টে পড়ে বইটই সব ছত্রখান। দেওয়ালে ঝোলানো ছবিগুলোও ভেঙে চৌচির। এলিভেটরের পরিবর্তে 'এমারজেন্সী এক্সিট'এর সিঁড়ি দিয়ে ছ' তলা থেকে নেমে এলাম আমরা।

জাপানের উচ্চতম অট্টালিকা 'ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার' আমাদের অফিস বাড়ী 'প্যাসিফিকো ইয়োকোহামার' সঙ্গে লাগোয়া। প্যাসিফিকো ইয়োকোহামার দোতলায় রয়েছে একটা বিশাল বড় খোলা ছাদ। এখান থেকে চোখে পড়ে ইয়োকোহামা বন্দর-সংলগ্ন প্রশান্ত মহাসাগরের একটা অংশ। তা এই ছাদই আপাতত অস্থায়ী নিরাপদ শিবিরে পরিণত হল। ছাদে তখন রীতিমত ভীড়। এখানে মাইকে 'পরবর্তী ভূকম্প' (আফটার শক্) এবং ৎসুনামি সতর্কতার ঘোষণা শোনা গেল। ৎসুনামির কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। মনে পড়ে গেল ২০০৪ সালে আমাদের দেশের আন্দামান ও চেন্নাইএর সমুদ্রতটে আছড়ে পড়া সেই ভয়ানক ৎসুনামির কথা। চিন্তা শুরু হল 'ডে কেয়ার'এ রেখে আসা আমার চার বছরের কন্যার জন্য।

এর মধ্যে পরবর্তী ভূকম্পগুলো হয়েই চলেছে, দুলে চলেছি আমরা। রাস্তার ওপাশে একটা কাঁচের বহুতল দেখলাম দুলতে দুলতে প্রায় মাটির কাছে নুয়ে পড়েছে। 'গেল, গেল' সবাই চিৎকার করে উঠলাম। কম্পন কমতে কমতেই ওটা অবশ্য আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল দেখলাম।

আস্তে আস্তে 'আফটার শক্' কম্পনগুলোর তীব্রতা কমে আসতে লাগল। দু ঘন্টা পর ঘোষণা করা হল যে এবার আমরা অফিসে ঢুকতে পারি। অফিসে টিভিতে 'সেন্দাই' আর 'মিয়াগী'-র খবর শুনে ও প্লাবিত ঘরবাড়ীর ছবি দেখে বুঝলাম ৎসুনামি আক্রমণ করেছে মিয়াগী জেলা সংলগ্ন অঞ্চলকে।

এই সময় একবার আমার স্বামী অনিন্দ্যকে মোবাইল ফোনে (এর আগে পর্যন্ত মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক কাজ করছিল না) পেয়ে জেনে নিলাম ও নিরাপদে আছে এবং গাড়ী নিয়ে ইতিমধ্যেই বেড়িয়ে পড়েছে মেয়ের 'ডে কেয়ার'এর উদ্দেশ্যে। জাপানের সরকারি ডে কেয়ারগুলিতে বাচ্চার যত্ন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ত্রুটিহীন। সেই একটা বড় ভরসা। অনিন্দ্য মেয়ের কাছে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে জেনে বেশ হাল্কা বোধ করলাম। ব্যাগ কাঁধে হাল্কা মনেই হাঁটতে লাগলাম বাসস্ট্যান্ডের দিকে।

ধাক্কাটা খেলাম বাসস্ট্যান্ডের ভীড়ে ভীড়াক্কার অবস্থা দেখে। এ দেশে ঘড়ি ধরে বাস, ট্রেন চলাচল করে। কিন্তু তখন তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও কোনো বাসের দেখা নেই। ক্ষুধার্ত অবস্থায়, ঠাণ্ডায় জমে, মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তায় আমার অবস্থা বেশ শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। এদিকে পায়ের তলায় মাটি মাঝে মাঝেই দুলে চলেছে। হাঁটতে হাঁটতে বহু দূর এসে দেখি একটা দুটো করে বাস চলতে শুরু করেছে।

আরেকটা ধাক্কা খেলাম বাস যখন 'মোতোমাচি' স্টপ ছাড়িয়ে এগোতে লাগল। ঘুটঘুটে অন্ধকার, জনহীন রাস্তাঘাট। জাপানে এ দৃশ্য অকল্পনীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'লোডশেডিং' বস্তুটির অভিজ্ঞতা এদের নেই বললেই চলে। এর মধ্যে অনিন্দ্য জানিয়েছিল যে চার ঘন্টায় চার ভাগের এক ভাগের রাস্তাও এগোতে পারে নি। অসম্ভব ট্র্যাফিক জ্যাম্। দুশ্চিন্তায় এবারে আমার চোখে জল এসে গেল।

আমার বাড়ীর স্টপে নেমে দেখি দোকান-পাট সব বন্ধ। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দু তিন জন পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে টর্চ হাতে। হাতড়ে হাতড়ে আমার সাইকেলটা খুঁজে বের করলাম। কাঁদতে কাঁদতে প্যাডেল করলাম মেয়ের ডে কেয়ারের দিকে। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার , বড় রাস্তায় ট্র্যাফিক সিগন্যাল অকেজো। জায়গায় জায়গায় জলের পাইপ ফেটে রাস্তাঘাট থৈ থৈ। যাইহোক, ডে কেয়ারে পৌঁছে কোনোরকমে অস্ফুটে মেয়ের নামটা উচ্চারণ করতে পারলাম। টর্চ হাতে দুজন সেনসেই (শিক্ষিকা) তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলেন। অন্যান্য বাচ্চারা ততক্ষণে বাড়ী চলে গেছে।

সেনসেইরা সবাই টর্চ জ্বেলে আমার মেয়েকে ঘিরে বসে আছেন। কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হলাম। তারপর সাইকেল করে মেয়েকে নিয়ে কোনক্রমে অন্ধকার সমুদ্র পেরিয়ে ফিরলাম নিজেদের কমপ্লেক্সে। রাস্তা তখনও মাঝে মাঝে দুলছে , আমার বুক কাঁপছে।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলাম কোনোরকমে । হাতড়ে হাতড়েই মেয়ের জন্মদিনের কেকে লাগাবার একটি শীর্ণকায় মোমবাতির অবশিষ্টাংশ বের করে জ্বালালাম। বিদ্যুতের সঙ্গে জল সংযোগও বন্ধ। মেয়েকে একটু খাইয়ে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই তৈরী করে ফেললাম একটা আপৎকালীন পুঁটুলি । ব্যাগের মধ্যে কিছু শুকনো খাবার, ফল, জলের বোতল, একটা কম্বল, গরম পোশাক ও টাকাপয়সা। বিপদ বুঝলেই যাতে ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে পড়তে পারি।

এক ঘন্টার রাস্তা, দশ ঘন্টা ধরে ড্রাইভ করে অনিন্দ্য বাড়ী পৌঁছাল । তখন রাত একটা । বিদ্যুৎ এল তারও পরে । টিভি চালিয়ে মিয়াগী জেলা ও আশেপাশের ৎসুনামি কবলিত অঞ্চলের বিধ্বংসী ছবি দেখে বুঝলাম ঘটনার ভয়াবহতা। অনুভব করলাম আপাতত ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছি আমরা।

এর পরের অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে রয়েছে মাঝে মাঝেই ভূকম্পনের দোলানী, বন্ধুবান্ধবের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা শোনা, সুপারমার্কেটগুলিতে খাদ্যবস্তুর ক্রমাভাব, তিন ঘন্টা লাইন দিয়ে দুধ সংগ্রহ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এরই মধ্যে শুনলাম ফুকুশিমা দাইইচি পরমাণু চুল্লির বিপদজনক দুর্ঘটনার কথা।

এখন সেপ্টেম্বর মাস । আমাদের প্রিয় দেশ জাপান এই ভূমিকম্প ও ৎসুনামির প্রাথমিক ধাক্কা আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠে পুনর্নির্মাণ করে চলেছে তাদের ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, অর্থনীতি । ধন্য জাপানীদের ধৈর্য, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অসম্ভব পরিশ্রমশীলতা। আমরা সকলেই মনে মনে জানি যে এই সাঙ্ঘাতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় জাপানের পরিবর্তে অন্য কোনো দেশে হলে তার পরিণাম হত আরও অনেক বেশী ভয়ঙ্কর।

যাইহোক, সর্বক্ষণই মনে মনে প্রার্থনা করি খুব তাড়াতাড়িই সব ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে আমাদের ভালোবাসার দেশ জাপান যেন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যা এ দেশের ইতিহাসে বারে বারেই ঘটেছে।

(এই লেখাটি পরিবর্ধিত রূপে "সমকাল কথা" নামক মাসিক পত্রিকার মার্চ, ২০১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে)

কেদারনাথ দর্শন

- সুপ্রভা কুমার

সেবার গরমের ছুটিতে কেদারনাথ দর্শন করার ইচ্ছা হল । যদিও এর আগে পাহাড়ে ভ্রমণ করার অভিজ্ঞতা ছিল , জানতাম কেদারনাথ কেবলমাত্র ভাগ্যবানেরাই দর্শন করতে পারেন । যাইহোক , "ভ্রমণসঙ্গী" পড়ে যাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে মে মাসের শেষের দিকে দূন এক্সপ্রেস-এ উঠে রওনা দিলাম । হরিদ্বার পৌঁছে গঙ্গাস্নান সেরে মায়াদেবীর মন্দিরে পুজো দিয়ে পরদিন সকাল সকাল রওনা দিলাম কেদারনাথের পথে । রাজাজী ন্যাশনাল পার্ক পেরিয়ে গাড়ি এসে থামল লক্ষণ ঝুলাতে । সেখানে থেমে লক্ষণ মন্দির দর্শন করে চললাম ঋষিকেশের দিকে । ঋষিকেশ থেকে গাড়ি পাহাড়ী সংকীর্ণ রাস্তা ধরে চলল গঙ্গাকে একপাশে আর পাহাড়কে একপাশে নিয়ে । পথে দেখলাম আশ্রম আর র‍্যাফটিংএর ক্লাব । ড্রাইভার জানালো রাস্তাটির নাম নাকি "মেরিন ড্রাইভ" । শিবপুরী দিয়ে যাবার সময় কদিয়ালাতে থেমে প্রাতরাশ সেরে খেয়াল করলাম গঙ্গার স্রোত বেশ তীব্র, কিন্তু উপর থেকে দেখে মনে হয়না ।

রাস্তা এসে শেষ হল দেবপ্রয়াগে যেখানে মন্দাকিনী, অলকানন্দা আর ভাগীরথী এসে গঙ্গার রূপ নেয় । দেবপ্রয়াগ থেকে গাড়ি চলল শ্রীনগরের দিকে, কত গ্রাম আর শহর পেরিয়ে গাড়ি এল কুণ্ডতে । এখান থেকে একটি রাস্তা গেছে উখিমথ, চপটা পেরিয়ে বদ্রীনাথের দিকে । কুণ্ড থেকে আরেক রাস্তা গেছে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গুপ্তকাশীর দিকে । ড্রাইভার রাস্তাতে একটি পেট্রল পাম্পে থেমে বলল এর আগে আর পেট্রল পাম্প নেই । এখানে একটি ছোট শিব মন্দির আছে আর প্রচলিত গল্প আছে শিবভক্ত বনসুর এককালে এই জঙ্গলে থাকতো ।

গুপ্তকাশী থেকে সোংপ্রয়াগ পাঁচ কিলোমিটার, গৌরীকুণ্ডের আগে এটাই তীর্থযাত্রীদের শেষ বিশ্রামের স্থান । এখান দিয়ে যাবার সময় উচ্চতার অনুভূতি বেশ ভালভাবে টের পাওয়া যায় । রাস্তাও বেশ চড়াই আর অসমতল, গাড়ি ঘোরানোর জায়গাও কম । আমাদের ড্রাইভার, যে এতক্ষণ ধরে বক্‌বক্‌ করছিল, সেও দেখলাম হঠাৎ চুপচাপ । শুধু ঝর্ণার শব্দ ছাড়া ঘন জঙ্গলে ঢাকা রাস্তায় আর কিছু শোনা যায়না । কান খোলার জন্য ক্রমাগত ঢোক গিলতে হচ্ছিল । রাস্তার অন্য দিক দিয়ে গাড়িতে ক্লান্ত কিন্তু পরিতৃপ্ত মুখে তীর্থযাত্রীদের ফেরার ভিড় । সন্ধ্যা হবার ঠিক আগে গাড়ি এসে পৌঁছল গৌরীকুণ্ডে । গাড়ি থেকে নেমে বুঝতে পারলাম ঠাণ্ডা কাকে বলে । এখানে তীর্থযাত্রীদের জন্য অনেক থাকার জায়গা যেগুলি বছরে ছ মাস খোলা থাকে । রাত্তিরে মন্দাকিনির প্রবাহের শব্দে ঘুম এল না, সকালে উঠতে উঠতে বেশ বেলা হয়ে গেল । গৌরীকুণ্ডে গৌরীদেবীর মন্দির দর্শন করে কিছু পূজার সামগ্রী কিনে তৈরি হলাম যাত্রার শেষ পর্বের জন্য ।

এখান থেকে কেদারের পথ বেশ ভাল ভাবে তৈরি, চড়াইও কম । বয়স্কদের জন্যে ডান্ডির ব্যবস্থাও আছে । মনে অনেক ভরসা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে উপনীত ভক্তদের সাথে "জয় কেদার", "হর হর মহাদেব" বলে শুরু করলাম যাত্রা । সকালের সূর্য আর তাজা বাতাস রাস্তার ক্লান্তি ক্ষণিকেই ভুলিয়ে দিল । ভক্তদের সাথে চলতে চলতে দুই কিলোমিটার পথ পার করে এসে পৌঁছালাম রামবড়াতে, উচ্চতা ২০০০ মিটার । রামবড়া থেকে ২৬০০ মিটারে পথের চড়াই আরও বেশি, মন্দাকিনি এখানেও আমাদের সঙ্গী, পাহাড়ের নিচে এঁকে বেঁকে বয়ে যাচ্ছে । রাস্তায় বেশ কিছু চায়ের দোকান -- চা, কফি ছাড়াও পরঠা, সব্জি, আলুপুরী এমনকি ম্যাগী নুডুলও বিক্রি হচ্ছে ।

গৌরীচাট্টিতে এসে দেখলাম কেদারনাথ মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে, এই কারণে এই জায়গাটিকে "দেও দেখানি" বলা হয় । এখান থেকে রাস্তায় আর গাছপালা নেই, রাস্তায় বরফ পড়ে আছে । ক্রমশ রাস্তায় চড়াই কমে আসে আর শেষের দিকে রাস্তা কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো । মন্দাকিনির সেতু পার করে কেদারনাথ মন্দিরের ধ্বজা দেখে মন ভরে গেল, কানে এল ঘন্টাধ্বনি । কেদারনাথ জায়গাটি কেদারনাথ পাহাড়ের পাদদেশে, বছরের কয়েক মাস মন্দাকিনির পারে বানানো একটি ছোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দিয়ে বিদ্যুৎ যোগান দেওয়া হয়, শীতে নদী জমে যাওয়া পর্যন্ত ।

কেদারনাথ মন্দিরটি বরফে ঢাকা পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে উঁচু চতুষ্কোণ জায়গার উপর বানানো, দেখে মনে হয় তিনদিক থেকে পাহাড়গুলি দিয়ে রক্ষিত । মন্দিরে ওঠার দুটি সিঁড়ি, সামনে ওঠার সিঁড়িটির দ্বারটি বিভিন্ন ধরণের ঘন্টা দিয়ে সাজানো । মন্দির দর্শন করে চললাম ভারত সেবাশ্রম সংঘে । ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, ঠাণ্ডা হাওয়া সমস্ত গরম জামাকাপড় ভেদ করে হাড় কাঁপিয়ে দেয় । আট ঘন্টার যাত্রার ধকল একটু একটু করে শরীরকে অবশ করে তুলছিল । কিন্তু ঘন্টা খানেকের বিশ্রাম আর বেশ কয়েক কাপ চায়ের পরে আবার ছুটলাম মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখতে । পাহাড়ের গায়ে মন্দিরের ঘন্টা আর শাঁখের আওয়াজের প্রতিধ্বনি মনে এক অন্য অনুভূতির জন্ম দেয় । মন্দিরে দাঁড়িয়ে মনে হয় হিমালয়ে এই নির্জনে, এই হিম সন্ধ্যায় শাঁখ আর ঘন্টাধ্বনিতে ভগবানের অর্চনা করার মত সার্থকতা জীবনে আর আসবেনা ।

ওম নমহ শিবায়ে ।

কারুইযাওয়া পরিভ্রমণ

- কাজুহিরো ওয়াতানাবে

এই লেখা লিখছি গরমের দাবদাহের মধ্যে । ১১ই মার্চের ভূমিকম্প জনিত ৎসুনামির আঘাতে ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র অকেজো হয়ে যাওয়ার পর এ বছর কেন জানি এসি চালাতে সংকোচ বোধ করছি, যদিও বিদ্যুৎ ঘাটতি তেমন প্রকট নয় । তাই ছুটির দিন বাড়িতে এসির পরিবর্তে ফ্যান চালাচ্ছি । ফ্যানের বাতাস গায়ে লাগিয়ে নিজেকে ভোলানোর চেষ্টা করি -- এটা কোনও কৃত্রিম বাতাস নয় । এটা হল কারুইযাওয়ার পাহাড়ী ভূমি দিয়ে বয়ে আসা সেই স্নিগ্ধ বাতাস ।

টোকিও থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত কারুইযাওয়া গ্রীষ্মকালীন অবকাশ কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত । সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় এক হাজার মিটার উঁচুতে অবস্থান এবং অন্যান্য ভৌগোলিক কারণে কারুইযাওয়াতে গ্রীষ্মকালেও তেমন গরম পড়ে না । আগস্ট মাসে রাজধানী টোকিওর তাপমাত্রা গড়ে ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের আশপাশে হলেও কারুইযাওয়াতে ২০ ডিগ্রী মত ।

সেই কারুইযাওয়াতে বেড়াতে গিয়েছিলাম ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে । গত বছর গ্রীষ্মকালে জাপানে অন্যান্য বছরের চেয়ে বেশী গরম পড়েছিল । আমার দুর্ভাগ্য, কারুইযাওয়াতে গিয়েও গরম থেকে রেহাই পাইনি । সেখানে তখন টোকিও-র আগস্ট মাসের গরম !

একটু আগে লিখেছি কারুইযাওয়াতে 'বেড়াতে' গিয়েছিলাম । আসলে কথাটা ঠিক হয় নি । গিয়েছিলাম মেয়ের বিয়ের জন্য । মৃদু বকুনি দিয়েছিলাম যখন মেয়ে কারুইযাওয়াতে বিয়ের অনুষ্ঠান করার ইচ্ছার কথা জানাল । বলেছিলাম, জানো, বিয়েতে যারা যাবে তাদের অধিকাংশ তোমার আত্মীয়-স্বজন । কারুইযাওয়া কারও পক্ষে সুবিধাজনক জায়গা নয় । আমরা থাকি কানাগাওয়া জেলায় আর আমাদের দিকের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকেই থাকে মধ্য জাপানের আইচিতে । ওদিকে বরের বাড়ি নাগানো জেলার দক্ষিণাংশে । একই নাগানো জেলার মধ্যে হলেও কারুইযাওয়া কিন্তু সেখান থেকে কাছে নয় । বরপক্ষের যেখানে বাস, সেখানকার মজা হল, এলাকার কোনও বাড়িতে বিয়ে হলে পাড়া-প্রতিবেশীরা অবশ্যই অংশ নেবে । আজকাল জাপানে সচরাচর আর এই নিয়মটা দেখা যায় না । এখন সাধারণত নিকট আত্মীয় এবং আমন্ত্রিত অতিথি ও বন্ধু-বান্ধবের অংশগ্রহণে বিয়ের অনুষ্ঠান ও পরবর্তী বিয়ের পার্টি সম্পন্ন হয়ে থাকে , অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে সীমিত সংখ্যক লোকই বিয়েতে যায় । সেই দিক দিয়ে বিচার করলে বরের বাড়ির এলাকায় প্রচলিত রীতিটি বর্তমান যুগে ব্যতিক্রমীই বলা যেতে পারে । এর অর্থ ওই মফস্বল এলাকায় সনাতন রীতিনীতি এখনও বজায় রয়েছে ।

যাইহোক, পাড়ার লোকেরা যাতে দলে দলে বিয়েতে যেতে পারে, তার জন্য বড় বাসের ব্যবস্থা করতে হবে । দূরে বিয়ে, তাই সবাইকে অনেক সময় ব্যয় করে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে । এত কষ্ট করার চেয়ে বরং আইচি আর দক্ষিণ নাগানোর মাঝখানে কোথাও বিয়ের আয়োজন করলে হয় না ? দুটি জায়গা মোটামুটি কাছাকাছি ।

এই ছিল আমার বক্তব্য । কিন্তু মেয়ে অত্যন্ত জেদি , কথা শুনতে চায় না । এই স্বভাবটা বোধহয় মায়ের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে ! কারুইযাওয়া ওর কাছে বিয়ের পার্টির জন্য খুব আকর্ষণীয় জায়গা । সেখানকার শৌখিন ও রোমান্টিক পরিবেশ শুধু আমার মেয়েকে নয়, অনেক তরুণীকেই টানে, আর আজকালকার যুগে তরুণীদের টানা হলে তরুণরাও আপনা-আপনি সেখানে গিয়ে হাজির হয় । শেষ পর্যন্ত আমাকে চুপ করে যেতে হল ।

বিয়ের তারিখ স্থির হয় ৪ঠা সেপ্টেম্বর । জায়গা -- কারুইযাওয়ার কেন্দ্রে একটি হোটেল । সেখানে একটি ছোট্ট গির্জা আছে, যেখানে খ্রীষ্টান মতে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয় । আমাদের পরিবারের কেউ খ্রীষ্টান নয় । কিন্তু ধর্ম-পালনের স্বাধীনতা আমাদের অর্থাৎ জাপানীদের মন্ত্র । বিয়ে করব খ্রীষ্টান বা শিন্তো মতে আর পরলোকে যাত্রা করব বৌদ্ধ পুরোহিতের আউড়ে যাওয়া মন্ত্র শুনতে শুনতে । আজকাল নাকি বেশীর ভাগ নবদম্পতির উদ্ভব হচ্ছে খ্রীষ্টান গির্জায় । এখানেও আবার কনের ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয় । খ্রীষ্টানদের বিয়ে তাদের খুব রোমান্টিক লাগে । তাই আমাকেও গির্জার দরজা খোলার সাথে সাথে মেয়ের হাত ধরে স্বল্প পরিসর করিডোর দিয়ে হেঁটে গিয়ে অপর প্রান্তে অপেক্ষমান বরের হাতে মেয়েকে তুলে দেওয়া এবং কাগজ দেখে একেবারে অপরিচিত খ্রীষ্টান কীর্তন গাওয়া ইত্যাদি অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হল । তবে যাই বলি না কেন, মেয়ের হাসিমুখ দেখে যে খুশীও হলাম, সে কথা স্বীকার করতেই হবে ।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলা এদো যুগে রাজনীতির কেন্দ্রস্থল এদো অর্থাৎ বর্তমান টোকিওর সঙ্গে আঞ্চলিক প্রধান শহরগুলোকে সংযুক্তকারী সড়কসমূহের উন্নয়ন করা হয়েছিল । সরকারী কর্মকর্তা সহ লোকের আনাগোনা ও পণ্য পরিবহনের সুবিধা বৃদ্ধি ছিল সেই জাতীয় প্রকল্পের উদ্দেশ্য । এতে যে ৫টি প্রধান সড়কের নির্মাণ ও সংস্কার সাধন করা হয়, নাকাসেন্দো মহাসড়ক ছিল সেগুলোর মধ্যে একটি । বর্তমান টোকিওর নিহোন্‌বাশি থেকে শুরু হবার পর ইতাবাশি, ওওমিয়া, তাকাসাকির মত শহর হয়ে বর্তমান নাগানো জেলার মধ্য দিয়ে চলে গিয়ে শিগা জেলার কুসাৎসুতে গিয়ে নাকাসেন্দো সড়ক মিশে যেত তোকাইদো মহাসড়কের সঙ্গে, তার পর কিয়োটো গিয়ে যাত্রা শেষ হত । সেই নাকাসেন্দো সড়ক বরাবর অন্যতম শহর হিসাবে কারুইযাওয়ার বিকাশ ঘটে ।

এদো যুগ শেষে মেইজি পুনরুত্থানের প্রায় ২০ বছর পর একজন কানাডীয় খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ঘটনাচক্রে কারুইযাওয়ায় যান । জায়গাটা তাঁর খুব পছন্দ হয় । কারণ এই ধর্মযাজকের মনে হয়েছিল কারুইযাওয়ার সাথে তাঁর নিজের শহর টরোন্টোর মিল আছে । ১৯৮৮ সালে তিনি কারুইযাওয়াতে বাগানবাড়ি তৈরি করেন । এই ঘটনা কারুইযাওয়ার জন্যে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল । জাপানে বসবাসকারী বিদেশীরা টোকিওর গরম এড়ানোর

জন্য কারুইযাওয়ায় একের পর এক বাগানবাড়ি বানাতে শুরু করলেন । জাপানের ধনী ও সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরাও সেই পথ অনুসরণ করলেন । গ্রীষ্মকালীন অবকাশ কেন্দ্র হিসাবে কারুইযাওয়ার নাম সারা জাপানে ছড়িয়ে পড়ল ।

মেয়ের বিয়ের একদিন আগে কারুইযাওয়ায় গিয়ে পৌঁছালাম । কারুইযাওয়াতে ঘন ঘন যাওয়া হয় না । ভাবলাম, এই সুযোগে জায়গাটা ঘুরে দেখলে মন্দ হয় না । যে হোটেলে বিয়ে হবে, সেখানে গিয়ে দুটো সাইকেল ভাড়া করলাম । কারুইযাওয়ার অন্যতম আকর্ষণ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের গ্রীষ্মকালীন বাগানবাড়ি । সেগুলো ঘুরে দেখতে সাইকেলই সুবিধাজনক । বাগানবাড়ির এলাকাটি নিরিবিলি ও জনশূন্য । কেবল মাঝে মাঝে আমাদের মত সাইকেল আরোহী পর্যটকদের দেখতে পাওয়া যায় । অসম্ভব গরম । ওদিকে আগস্ট মাস শেষ হয়ে যাওয়াতে বাগানবাড়িগুলোর বাসিন্দারা হয়তো ইতোমধ্যে টোকিও ফিরে গিয়েছেন । তাছাড়া প্রতিটি বাড়ি বিশাল জমির ওপর নির্মিত এবং গাছপালায়

পরিবেষ্টিত হওয়ায় রাস্তা থেকে ভিতরের কথা জানার কোনও উপায় নেই ।

জাপানে কোনও ব্যক্তির নামে রাস্তার নামকরণের দৃষ্টান্ত বিরল । তবে কারুইযাওয়া তার ব্যতিক্রম । সেখানে এমন বেশ কিছু রাস্তা আর গলি আছে যেগুলো আগেকার দিনের বাগানবাড়ির মালিক বিশিষ্ট লোকেদের নামে পরিচিত । সে রকম রাস্তার মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হচ্ছে হাতোইয়ামা এভেন্যু । প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইউকিও হাতোইয়ামার পিতামহ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইচিরো হাতোইয়ামা কারুইযাওয়াতে বাগানবাড়ি করার পর এই নামের উৎপত্তি । হাতোইয়ামা পরিবারের এই বাড়ি আমরা সেখানে যাওয়ার কিছু দিন আগে গণমাধ্যমের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় । ২০১০ সালের জুলাই মাসে সেই বাড়িতে গিয়েছিলেন উত্তর কোরিয়ার সাবেক গুপ্তচর কিম হিয়ন হী । ১৯৮৭ সালে কোরীয় এয়ারলাইন্সের এক বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে অভিযুক্ত এবং পরে দক্ষিণ কোরীয় প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমা প্রদর্শনে মুক্তি প্রাপ্ত এই প্রাক্তন মহিলা গুপ্তচর জাপানী ভাষা পড়েছিলেন । তাঁর প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন একজন জাপানী মহিলা যাকে জাপান থেকে অপহরণ করে পিয়ংইয়াং নিয়ে যাওয়া হয় । ২০১০ সালে কিম হিয়ন হী সরকারের আমন্ত্রণে জাপানে এসেছিলেন অপহৃতা মহিলা ও অন্যান্য ভুক্তভোগীদের পরিবার-পরিজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য । তাঁদের সাক্ষাতের জন্য বেছে নেওয়া হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বাগানবাড়িটি । সেই সময় বাড়িটির চারপাশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেও আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখন ঐ পাড়ায় আগের মত শান্ত পরিবেশ ফিরে এসেছে ।

বাগানবাড়ি এলাকার শান্ত নিরিবিলি পরিবেশের বিপরীত আমাদের হোটেলের অদূরে পুরোনো কারুইযাওয়ার বিপণি এলাকা । গাড়ির প্রবেশ নিষিদ্ধ রাস্তার দুধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন খাবারের দোকান ও সুভেনীর শপ্ । সেপ্টেম্বর মাস পড়ে গেলেও পর্যটকের ভিড়ে জায়গাটি পরিপূর্ণ । দোকানগুলির মধ্যে সসিজ ও মধুর দোকান বেশী চোখে পড়ে । একটা মধুর দোকানের সামনে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম । এক প্রৌঢ় বসে আছেন । তাঁর মুখ থেকে বুক অবধি কালো রঙের কি যেন গিজ্‌গিজ করছে । হুট্ করে দেখলে বড় দাঁড়ির মত মনে হবে, কিন্তু আসলে সেগুলো মৌমাছি ! অসংখ্য মৌমাছি মুখ ও বুকে লাগিয়ে ভদ্রলোক মৃদু মৃদু হাসছেন । দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা, 'মৌমাছি-দাঁড়ি কাকু' । পরে জানতে পারলাম এই দোকানের পরিচালক কম্পানী মৌমাছির চাষ ও মধু উৎপাদন করে এবং ভদ্রলোক এই কম্পানীরই প্রধান । দোকানের বিজ্ঞাপন হিসাবে তিনি নিজেই গায়ে মৌমাছি লাগিয়ে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছেন । তাঁর চেষ্টা অভিনব এবং দুঃসাহসিক বলে মনে হলেও আমাকে মধু কিনতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি , কারণ মৌমাছির হুল ফুটিয়ে দিলে যে যন্ত্রণা , ছোটবেলায় তাতে কষ্ট পাওয়ার একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল ।

হোটেলে ফিরে গিয়ে সাইকেল ফেরত দিয়ে গাড়িতে চড়লাম । এবার দেখতে যাব রবীন্দ্রনাথের মূর্তি আর সেটাই এই পরিভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য । রবীন্দ্রনাথ কারুইযাওয়াতে এসেছিলেন ১৯১৬ সালে, তাঁর প্রথম জাপান সফরের সময় । এই সফরকালে তাঁর পরিচয় ঘটে নিহোন জোশি দাইগাকু (জাপান মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়)-এর প্রতিষ্ঠাতা জিন্‌যো নারুসের সঙ্গে । নারুসের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ টোকিওর মেজিরো অঞ্চলে অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সামনে কথা বলেন । সে বছর আগস্ট মাসে তিনি নারুসের আমন্ত্রণে কারুইযাওয়াতে আসেন এবং জাপান মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন ছাত্রীনিবাসে ১৬ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত ৬ দিন অবস্থান করেন । এই ভবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাস নেওয়া এবং অবসর বিনোদনের মত বিশেষ উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে নির্মিত হয় ।

ভবনটির উদ্যানে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন । সেই সময় তোলা ছবিতে আমরা দেখতে পাই একটি বড় গাছের তলায় বসে রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন এবং মেয়েরা মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে তাঁর কথা শুনছে ।

কারুইযাওয়াতে বিশ্বকবির আগমনের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য ১৯৮১ সালে তাঁর জন্মের ১২০তম বার্ষিকী উপলক্ষে একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপন করা হয়। নাকাসেন্দো মহাসড়কের পুরোনো রুটের পাহাড়ী পথ বেয়ে সেটি দেখতে গিয়েছিলাম।

মূর্তি থেকে অদূরে একটি চায়ের দোকান। এখানে চালের গুঁড়ো দিয়ে এক ধরণের জাপানী মিষ্টি তৈরি করা হয়, যা পর্যটকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। দোকানের মহিলা মালিকের কাছ থেকে মূর্তিটি স্থাপনের সময়কার ইতিবৃত্ত জানার সুযোগ হল। তিনি আমাকে বললেন, জাপান মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তোমি কোরা মূর্তি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে কোরা ছিলেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং রবীন্দ্রনাথের দোভাষী হিসেবে কাজ করে কবিগুরুর ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমি কোরার সম্পর্ক নিয়ে অধ্যাপক কাজুও আজুমার লেখা ("উজ্জ্বল সূর্য" ৫৪ পৃষ্ঠা; সুবর্ণরেখা, ১৯৯৬) থেকে উদ্ধৃত করছি।

'১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাপান ভ্রমণের সময় তোমি কোরা ছিলেন জাপান মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে এক ভাষণ দেন। তাঁর স্নিগ্ধ কণ্ঠের অপূর্ব ভাষণে তোমি কোরা মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন। তাঁর এই আকর্ষণ আরো বেড়ে ওঠার সুযোগ এসে যায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশ জনের মতো ছাত্রী গরমের সময় যায় এক শৈলাবাসে। তাতে ইংরেজী বিভাগের শ্রেষ্ঠ ছাত্রী তোমি কোরা ছিলেন। ঘটনাক্রমে রবীন্দ্রনাথও সেখানে যান এবং ইংরেজিতে ধারাবাহিক ভাষণ দেন। তিনি তোমি কোরার ব্যক্তিত্ব ও ইংরেজি জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে তাঁর ভাষণের নোট নিতে এবং অন্যদের তা বুঝিয়ে দিতে বলেন। রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন বিরাট এক দেবদারু গাছের ছায়ায়। সেই গাছটি এখনও রয়েছে। তোমি কোরা রবীন্দ্রনাথের স্নেহ সম্বোধনে কৃতার্থ হয়ে আনন্দে তাঁর সব আদেশ পালন করতেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার নোট নেওয়া সেই অমূল্য খাতাটি আজও সুরক্ষিত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দর্শন, তাঁর বাণী শ্রবণ ও আদেশ পালনের মধ্য দিয়ে কোরার অন্তরে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের যে সহজ সুন্দর ছাপ পড়ে তা আমৃত্যু তাঁকে পথ দেখিয়েছে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন।'

কোরা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জাপান ভ্রমণের সময়ও তাঁর দোভাষী হিসাবে কাজ করেছেন। কবিগুরুর সাথে দেখা করার জন্য শান্তিনিকেতনেও পাড়ি দিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তোমি কোরা জাপানের জাতীয় সংসদে প্রথম মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন। রাজনীতিবিদ হিসাবে কাজের পাশাপাশি তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা জাপানী ভাষায় অনুবাদ করতেন।

কোরার উদ্যোগে যে মূর্তিটি স্থাপন করা হয়, সেটি তৈরি করেছেন খ্যাতনামা ভাস্কর হিরোয়াৎসু তাকাতা। মূর্তির তলায় দেবনাগরি অক্ষরে লেখা একটি শব্দ খোদাই করা আছে 'অহিংসা'। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ভারতীয় দর্শনের বিশিষ্ট গবেষক হাজিমে নাকামুরা এটি লিখেছিলেন। তার পাশে রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

চায়ের দোকানের মালিক মহিলা আমাকে বলেছিলেন, "বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে অনেক লোক এখানে বেড়াতে আসে গরম থেকে মুক্তি পেতে আর আমাদের দোকানের মিষ্টি খাওয়ার আকর্ষণে, কিন্তু তোমার মত রবীন্দ্রনাথের মূর্তি দেখতে আসা লোক বিরল।" তিনি জানান আজকাল অধিকাংশ পর্যটক কবিগুরু-র মূর্তি দেখে তাঁকে চিনতে পারে না। মহিলার কণ্ঠে ছিল কিছুটা আক্ষেপের সুর। তোমি কোরা, অধ্যাপক আজুমা ও জাপানে নিযুক্ত তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতে যে দিন রবীন্দ্রনাথের মূর্তি উন্মোচন করা হয়, যেন সেদিনের স্মৃতি তাঁর মনে ভেসে উঠছিল।

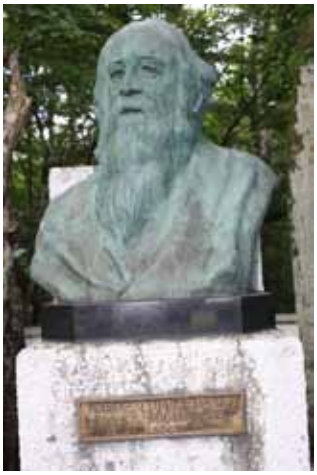

কালের স্রোতে সব কিছু ভেসে যেতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথকে চেনেন এমন লোকের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে জাপানে। এদিকে কারুইযাওয়াতে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি নির্মাণের জন্য যাঁরা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন , তোমি কোরা সহ তেমন অনেককেই আমরা হারিয়েছি ইতিমধ্যে। এমন কি অধ্যাপক আজুমাও চলে গেলেন এই সেদিন। তবে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি সেই পাহাড়ী পথের মনোরম দৃশ্যের মাঝে দাঁড়িয়ে আমাদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছেন, এটা মনে করতেও আমার ভাল লাগে সব সময়।

আমাদের মেয়ের জেদের কারণে কারুইযাওয়াতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আবার দেখা করার সুযোগ হল। তাই ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আমার হয়তো বলা উচিত, "জেদ দেখিয়ে কাজের কাজই করেছিস মা" !

কালিম্পং ও রবীন্দ্রনাথ

- তপন কুমার রায়

এ বছর রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষ উৎসব। দেখতে দেখতে পঞ্চাশটা বছর পেরিয়ে এলাম। মনে হচ্ছে এই সেদিন শতবর্ষ হল। একষট্টি সালে রবীন্দ্র শতবর্ষে আমরা স্কুলে ক্লাশ টেন-এ পড়তাম। এখনও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এলেই কালিম্পং শহরটার কথা মনে পড়ে। এর সঙ্গে আমার শৈশব আর কৈশোরের সন্ধিক্ষণে প্রথম কালিম্পং-এর এক মাসের সুখস্মৃতি ভেসে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তে দার্জিলিং জেলায় কালিম্পং শহরটি বরাবরই দুয়োরানীর ব্যবহার পেয়ে এসেছে। সবাই দার্জিলিং আর কার্সিয়াংকে অন্য নজরে দেখত। স্কুল, হোটেল, ব্যবসা, চা বাগান সবই ওই দুটো শহরকে কেন্দ্র করে।

কালিম্পং-এ প্রথম যাই ১৯৫৬ সালে আমার মায়ের সঙ্গে, আমার দশ বছর বয়সে যখন সদ্য কৈশোরে পা দিয়েছি। বাবা একদিন স্কুলে এসে হোস্টেল থেকে প্রিন্সিপালের বিশেষ অনুমতি নিয়ে গরমের ছুটির দু দিন আগেই আমাকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় গাড়ীতে যখন বললেন আমি মায়ের সঙ্গে পর দিন কালিম্পং যাব, আনন্দে আর উত্তেজনায় নিজেকে সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

পর দিন শেয়ালদা স্টেশন থেকে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে যাত্রা। সঙ্গে মায়ের বন্ধু মায়া কাকিমা আর আমাদের রান্নার লোক বৃন্দাবন ঠাকুর। সন্ধ্যাবেলা ট্রেন গঙ্গা পাড়ে সকড়িগলি ঘাটে এসে থামলো। সবাই মিলে বালির ওপর টর্চের আলোয় কুলির পেছন পেছন স্টীমারে উঠলাম। সারেংদের রান্না মুরগীর ঝোল আর ভাত। আধ ঘন্টার জলপথ। ওপারে মনিহারী ঘাট। আরেকটা ট্রেন আমাদের জন্য অপেক্ষায়। সারা রাত ট্রেনযাত্রা। ভোরবেলায় শিলিগুড়ি। ওখানে একটা ল্যান্ডরোভার আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিল। তিস্তা পেরিয়ে গাড়ী যখন পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরল তখন সামনে অন্য একটা জগৎ। গাছপালা, লতা-গুল্ম, আশপাশের বাড়ী-ঘর, সবই যেন আলাদা। রাস্তার ধারে মানুষজনের চেহারাও অন্যরকম। ওদের পোষাক থেকে কোন কিছুর সঙ্গেই আমাদের কোন মিল নেই। কলকাতার আমি ওখানে যেন একেবারে বেমানান। খানিক বাদে মা ব্যাগ থেকে আমার সোয়েটার বের করলেন। এবার আবহাওয়াটাও সম্পূর্ণ বদলে গেল। গাড়ী ক্রমশ ঘুরে ঘুরে এগিয়ে চলল। একদিকে খাদ আর অন্যদিকে উঁচু পাহাড়। নিচে তিস্তা সরু সুতোর মত দেখাচ্ছিল। পাহাড়ের গায়ে নানা রকম ফার্ণ, কলাবতী আর কতরকমের গাছ আর ফুল। কলকাতায় যেসব ফুল বাগানে থাকে সেসব এখানে রাস্তার ধারে দেখে যার পর নাই বিস্মিত।

ঘন্টা কয়েক পর কালিম্পং শহরে গাড়ী পৌঁছল। ছোট্ট ছবির মত শহর। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বাড়ী, গাছপালা সব যেন মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। শহর থেকে আবার খানিকটা চড়াই। একটা ছোট কাঁচা রাস্তা ধরে আরেকটা চড়াই ভেঙ্গে একটা গেটের সামনে দাঁড়াতে একজন নেপালী দারোয়ান গেট খুলে আমাদের আপ্যায়ন করল। বাড়ীটার নাম নাশীম লজ্। বাবার মক্কেল আদমজী, যাদের পূর্ব্ব পাকিস্তানে জুট মিলের ব্যবসা ছিল, তারা এই বাড়ীর মালিক। ভেতরে দোতলা বাড়ীর সামনে গাড়ী থেকে মালপত্র নামিয়ে বসার ঘরে আমাদের জলের জাগ আর গ্লাস একটা ট্রেতে দিয়ে গেল। দোতলায় মা সব জিনিষপত্র গুছিয়ে বৃন্দাবনকে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলল।

বাড়ীটা দোতলা। নিচে রান্নাঘর, খাবার ও বসার ঘর ছাড়া আরেকটা ঘর ছিল। ওখানে একটা আলমারীতে ঠাসা বই। ইংরেজী ছাড়াও অনেক বাংলা বইও ছিল। একধারে একটা টেবিল আর একটা টেবিল ল্যাম্প। প্রত্যেক ঘরে ফুলদানিতে এক এক রকম ফুল। সব ফুলের নাম জানতাম না। ওপরে বড় বড় তিনটে শোবার ঘর আর সঙ্গে লাগান একটা করে চানঘর। ওপরে ঢালু ছাদ। প্রত্যেকটা ঘরে পর্দা ঢাকা বড় বড় কাঁচের জানলা। পর্দা সরালেই চোখের সামনে বিশাল হিমালয়। মেঘ না থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘা সকাল থেকে নানা রঙে সেজে থাকত। পরদিন সকাল হতেই বাইরে বাগানে একা একা ঘুরতে বেরলাম। বাহাদুরের ছেলে আর মেয়ে প্রায় আমার বয়সী। ওদের নাম কাঞ্চা আর কাঞ্চী। ওরাই আমার বন্ধু আর গাইড হয়ে গেল। ওদের সঙ্গে পাকদন্ডী দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে কত জায়গায় যেতাম। পাহাড়ের গায়ে অত রকমের গাছ আর ফুল দেখতে খুব ভাল লাগত। ওরা কোন ফুলের বা গাছের নাম জানত না। স্থানীয় কুকুরগুলোর গায়ে কত লোম। প্রথমে ওদের আমি পোষা কুকুর ভেবেছিলাম। আমার গাইড ভুল ভেঙ্গে দিল। ওরা বাংলা জানেনা আর আমি ওদের ভাষা জানিনা, কিন্তু ভাবের আদান-প্রদানে কোন অসুবিধে হয় নি। পরদিন সকালে ওরা আমাকে একটা ডাল ভেঙ্গে ছড়ি বানিয়ে দিয়েছিল। বুঝিয়েছিল ওতে নাকি পাহাড়ে চলতে সুবিধে হয়।

এর মধ্যে মাঝে মাঝে একলা বাড়ীর বাগানে ঘুরে বেড়াতাম। ওখানকার পাহাড়, গাছ আর মেঘ আমার বেশ বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। মা আমাকে অনেক গাছের নাম বলে দিত। সব নাম অবশ্য মনে থাকত না। বাড়ীর ভেতরে একটা বড় গাছে বিরাট কয়েকটা সাদা ফুল ফুটেছিল। ফুলের গন্ধে জায়গাটা বিশেষ করে সন্ধ্যেবেলায় মেতে থাকত। শুনলাম ওই ফুলটার নাম ম্যাগনোলিয়া।

এর মধ্যে একদিন সকালে মা আর মায়া কাকিমা আমাকে নিয়ে ওই রিং টিং পং রোড ধরে হাঁটতে বেরল। খানিকটা গিয়ে ডান দিকে একটা কাঁচা রাস্তা ধরে এগোলে 'গৌরীপুর লজ'। বেশ খাড়াই নিচু কাঁচা রাস্তা দিয়ে বাড়ীর সদরে যেতে হয়। বিরাট বাড়ী। ওপরের পাহাড় থেকে সোজা দোতলাতে যাওয়ার ব্যবস্থা। ওদিকটা রান্নাঘর। কাজের লোকজন সদরে না গিয়ে সোজা দোতলার রান্নাঘরে যেতে পারে। বাড়ীটার ছাদ এ্যাসবেস্টসের নানান ঢালে সাজানো। সদরে যাবার সময় লক্ষ্য করলাম একটা মার্বেল ফলকে লেখা রবীন্দ্রনাথ কোনো একটা পঁচিশে বৈশাখ এই বাড়ী থেকে

'জন্মদিন' কবিতাটা আবৃত্তি করেছিলেন যেটা অল ইন্ডিয়া রেডিও সরাসরি ব্রডকাস্ট করেছিল । রবি ঠাকুর এই বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন। সঙ্গে ওনার পুত্রবধূ প্রতিমা ঠাকুর এবং রাণী চন্দ আসতেন । এই বাড়ীতে ওনার অনেক সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাস আছে । বাড়ীটা মায়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখলাম । বিরাট বারান্দা, বড় বড় ঘর । রবি ঠাকুরের ব্যবহৃত ঘরে এসে ঠিক মনে হল কোন তীর্থস্থানে এসেছি । পরে পড়েছি প্রতিমা দেবীর "নির্ব্বাণ" বইতে, রবি ঠাকুর এই বাড়ীতে শেষ বার এসেছিলেন বিশে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ সালে । পঁচিশে অসুস্থ কবিকে এখান থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয় । সেদিন প্রচণ্ড ঝড় জলে ওই কাঁচা রাস্তায় এত কাদা হয় যে প্রশান্ত মহলানবীশ ও অন্যান্যদের বেলচা দিয়ে কাদা পরিষ্কার করতে হয় । রেডিওতে কবির ছেলে রথীন্দ্রনাথকে খবর দেওয়া হয় । পরের বছর জুলাই মাসে ওনার অপারেশন হয় যার পর উনি আর সুস্থ হন নি । বাড়ীটা দেখে আমরা ফিরলাম বেশ বেলা করে ।

পর দিন বিকেলে আরেক চমক ! মা আমাকে নিয়ে গেলেন চিত্রভানুতে । ওই বাড়ীটা আমাদের বাড়ী থেকে নীচে নেবে একটা তিন মাথার মোড়ে শহরের রাস্তায় না গিয়ে বাঁ দিকে । ভেতরে ঢুকে সোজা নুড়ি ফেলা রাস্তা । তার পর বাঁ দিকে একটা সুন্দর বাংলো । সামনে একটা টানা বারান্দা । ওখানে আমাদের জন্য অপেক্ষায় স্বয়ং প্রতিমা দেবী । খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম । সেই সময়, 'আমাদের ছোট নদী ----' বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা আমার জানা ছিল না । ভয় হল যদি কবিতা বলতে বলেন । খুব রাশভারী চেহারা । দেখলেই মনে হয় পড়া জিজ্ঞেস করবে । এক এক জনের চেহারা ওই রকম হয় । আমি বড়দের গল্পের থেকে একটু দূরে বাগান দেখতে লাগলাম । পাঁচিলের গায়ে ছোট্ট একটা বাঁধানো চৌবাচ্চা । তাতে সুন্দর সুন্দর নানারকম রঙ্গীন মাছ । ঠিক ওপরটায় ভাঙ্গা কাপ ডিশ দিয়ে একটা কবিতা লেখা –

'আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রং, জানে তা কি এ কালিম্পং ---- ?'

কবিতাটা পড়তে পড়তে মনে হল কালিম্পং নামটার মধ্যেই যেন একটা পিয়ানোর ঝংকার লুকানো আছে । যেন একটা সুরের নাম । ভেবে রেখেছিলাম মাকে পরে এটা বলব । হঠাৎ মায়ের গলা --- আমাকে ডাকছেন । ওঁদের সামনে যেতে প্রতিমা দেবী আমাকে ওঁর কাছে টেনে নিলেন । বললেন, 'তুমি নাকি কবিতা লেখ ?' মায়ের ওপর খুব রাগ হল । একটা লিখেছিলাম আর ওটা আনন্দবাজারে ছাপা হয়েছিল । নিশ্চয় মা ওঁকে সেটা বলে দিয়েছে । উনি আমাকে কবিতাটা বলতে বললেন । আবৃত্তি শেষ হতে বললেন, 'বলতো এ বাড়ীতে একটা কবিতা আছে সেটা কি ?' আমি সঙ্গে সঙ্গে 'আমার আনন্দে আজ একাকার --- ' বলে দিলাম । উনি খুশী হয়ে আমাকে টেনে নিয়ে সোজা গালের ওপর একটা চুমু আর পুরস্কার হিসেবে একটা চকলেট । ব্যাস --- আমার পৌরুষত্বে ঘা । প্রায় ছিটকে যাবার চেষ্টা ।

মায়েরা প্রতিমা দেবীর মুখে গৌরী লজে রবি ঠাকুরের নানা গল্প শুনছিল । আমিও পাশে শ্রোতা । সব বুঝিনি, তবে ঘটনাটা আমার মনে বড় একটা দাগ কেটে গেল যেটা জীবনভর ভুলতে পারব না । প্রতিমা দেবী এই বাড়ীতে ১৯৪৫ সালের ৮ই আগষ্ট গৃহপ্রবেশ করেছিলেন । সেদিনটা ছিল বাইশে শ্রাবণ । আমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আর হিমালয়ের একটা অদ্ভূত প্রভাব পড়ল যা আজও জীবনের সপ্তম দশকে বয়ে বেড়াচ্ছি ।

এর পর অনেক বার কালিম্পং গিয়েছি । হিমালয় আমাকে বরাবর আকর্ষণ করে । হিমাচল, উত্তরাখন্ড এবং হিমালয়ের অন্যান্য বহু জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি । রবীন্দ্রনাথ ওঁর বাবামশায়ের সঙ্গে ডালহৌসী পাহাড়ে নিজের কৈশোরে গিয়েছিলেন । সেই স্মৃতি ওঁকেও সারা জীবন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ।

এর পর ছেলে মেয়েকে নিয়ে তিরানব্বই সালে গৌরীপুর লজ্ ও চিত্রভানু দেখতে গেলাম । গৌরীপুর লজ্ অযত্নে, আর

চিত্রভানুতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেয়েদের ক্রাফ্ট টীচার্স ট্রেইনিং সেন্টার করেছে যেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ । ভারী মন নিয়ে ফিরে এলাম । শুনেছিলাম গৌরীপুর লজ্ সরকারী তত্বাবধানে রবীন্দ্র সংগ্রহশালা হবে । দু হাজার সাত সালে আবার গেলাম । বাড়ীটার খুবই দৈন্য দশা । গুটিকতক নেপলী পরিবার দখল করে রেখেছে । চারদিক ঝোপঝাড়ে ভর্তি । দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ছে । ছাদের অবস্থাও তথৈবচ । গুটিকয়েক ছবি তুলে এনেছি । দেখে মনে হয় এখনও মেরামত করা সম্ভব ।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরলাম । আর বোধহয় ওখানে যাব না । কৈশোরের স্মৃতিকোঠায় যা আছে তা থাক না । জানিনা আমাদের ইতিহাস সচেতনতা কবে ফিরবে । মনীষীদের স্মৃতি বিজড়িত জায়গাগুলোর প্রতি কি একটু দৃষ্টি দেওয়া যায় ?

রবীন্দ্রনাথের ছোট কবিতা

- কিওকো নিওয়া

এ কথা বিস্তারিতভাবে জানা আছে যে রবীন্দ্রনাথ বড় এবং ভাবগম্ভীর কবিতা লেখার পাশাপাশি কখনও কখনও ছোট ছোট কবিতাও লিখেছিলেন। এটাও জানা গেছে যে জাপানে বা বিভিন্ন দেশে যখন তাঁকে একটা কিছু লিখতে অনুরোধ করা হত তখন তিনি কাগজে, রুমালে বা অন্যান্য জিনিসের উপরে ছোট কবিতা লিখতেন। তিনি অবশ্যই জাপানের ছোট কবিতা, হাইকু জানতেন, হাইকু সম্পর্কে কিছু লিখতেনও। তবে রবীন্দ্রনাথ হাইকুর আকার অনুকরণ করে যে ছোট কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন, তা নয়।

আসলে রবীন্দ্রনাথের ছোট কবিতা লেখা হয়েছে জাপানে প্রথমবার আসার অনেক বছর আগে থেকেই। "কণিকা" নামক ছোট কবিতার সংকলন বেরিয়েছিল ১৮৯৯ সালে। তার মানে জাপানের সাথে বিশেষ কোনো সম্পর্ক তৈরি হওয়ার আগে তিনি এই কবিতাগুলো লিখেছিলেন। তবে তার পরে তিনি অনেক বছর ধরে এরকম ছোট আকারের কবিতায় হাত দেন নি।

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ একজন জাপানী বুদ্ধিজীবি ওকাকুরা কাকুযোর সঙ্গে পরিচিত হন। সেই সূত্রে তার পরেও তিনি বেশ কয়েকজন জাপানীর সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯০৫ সালে জাপান-রুশ যুদ্ধের সময় জাপানের পরাজয়ের পর যে তিনটি ছোট কবিতা তিনি প্রকাশ করেন, সেগুলোর উপর জাপানী কবিতার প্রভাব দেখা যায়।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার জাপানে এসেছিলেন। সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি তাঁর লেখা "জাপান-যাত্রী" থেকে। এখানে তিনি মাৎসুও বাশো-র দুটি হাইকু কবিতার পরিচয় দিয়েছেন নিজের বিশ্লেষণের সাথে। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের ছোট কবিতা বদল হয়েছে জাপানী হাইকুর ভাবনাকে স্পর্শ করেই। কারণ "কণিকা"র কবিতাগুলোকে বলা হয় epigram, এদিকে এর পরের ছোট কবিতায় কাব্য ভাবনা বা কাব্যকলা আরো বেশী দেখা যায়।

এই জাপান ভ্রমণের পরে রবীন্দ্রনাথের ছোট কবিতার দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে, একটা হল "লেখন" (১৯২৭) আর অন্যটা হল "স্ফুলিঙ্গ" (১৯৪৫)। "লেখন" প্রকাশ করার সময় তিনি সেই ছোট কবিতাগুলো নিয়ে এভাবে বলেছেন : "জাপানে ছোটো কাব্যের অমর্যাদা একেবারেই নেই। ছোটোর মধ্যে বড়কে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের -- কেননা তারা জাত-আর্টিস্ট। সৌন্দর্য-বস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না। সেইজন্য জাপানে যখন আমার কাছে কেউ কবিতা দাবি করেছে, দুটি-চারিটি লাইন দিতে আমি কুন্ঠিত হই নি। তার কিছুকাল পূর্বেই আমি যখন বাংলাদেশে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গান লিখেছিলুম, তখন আমার অনেক পাঠকই লাইন গণনা করে আমার শক্তির কার্পণ্যে হতাশ হয়েছিলেন -- এখনো সে-দলের লোকের অভাব নেই। এইরকম ছোটো ছোটো লেখায় একবার আমার কলম যখন পেতে লাগল তখন আমি অনুরোধ নিরপেক্ষ হয়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা-তা লিখেছি এবং সেইসঙ্গে পাঠকদের মন ঠাণ্ডা করবার জন্যে বিনয় করে বলছি;

আমার লিখন ফুটে পথধারে ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে চলিতে চলিতে ভুলে।

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এটা ক্ষণিক কালের ফুলের দোষ নয়, চলতে চলতে দেখারই দোষ। যে - জিনিসটা বহরে বড়ো নয় তাকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখি নে, যদি দেখতুম তবে মেঠো ফুল দেখে খুশি হলেও লজ্জার কারণ থাকত না। তার চেয়ে কুমড়োফুল যে রূপে শ্রেষ্ঠ নাও হতে পারে।"

শুধু জাপানীদেরই "ছোটোর মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা" আছে, তা বলা যায় না। তবে রবীন্দ্রনাথ জাপানী সংস্কৃতিতেই সেই সাধনা আবিষ্কার করেছেন, এটাকে নিশ্চয়ই আমাদের গর্ব করার মতো তথ্য বলা যায়। তার উপরে আমাদের হাইকু কবিতার স্পর্শ, রবীন্দ্রনাথের কবিতা-ভাবনা বা কাব্যকলাকে যদি সামান্যও প্রভাবিত করে থাকে, তাহলে এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে !

সে যাইহোক, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, ছোট বা বড়, কোনোমতেই ক্ষণিক কালের জন্য ফোটা ফুলের মত রচনা নয়। তবুও অনেক জাপানী পাঠক এসব কবিতাকে "চলিতে চলিতে দেখে চলিতে চলিতে ভুলে" যায়, তাই নয় কি ? যদি তাই হয় , সেটা রবীন্দ্রনাথের দোষ নয় বটে, আমাদেরই দোষ।

গেরুয়া বাস পরি
ধর্মগুরু
শিখাতে গিয়েছিল
তোমার দেশে।
আজি সে শিখিবারে
কর্মনীতি
তোমার দ্বারে ধায়
শিষ্যবেশে ।।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আষাঢ় ১৩১২)

পুজো, প্রকৃতি ও ঈশ্বর

- তিতলি বাসু

সারাদিন কাজ শেষে একটু ক্লান্তি গায়ে মেখে ঘরে ফিরেছি সেদিন। হঠাৎই সেলফোনটা বেজে উঠল। বোতাম টিপে দেখলাম অন্য প্রান্তে রুমা মাসী। ভাল লাগল পরিচিত জনের গলা পেয়ে। ও প্রান্ত থেকে অনুরোধ এল এবার পুজোর 'অঞ্জলি'তে কিছু লিখে দেওয়ার জন্য। এ প্রান্তে মাথায় হাত ! যাইহোক, দ্বিধা কাটিয়ে মাসীকে বললাম -- আচ্ছা কিছু একটা হবে। তারপর এক রোববার কলম নিয়ে সেই 'কিছু একটার' খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

কলকাতায় কলেজের পাট শেষ করে পরের অধ্যায়ের জন্য যখন দিল্লীতে গেলাম তখন একবারও মনে হয়নি যে অপরূপা এই জাপান দেশটি কোনোদিন মনের মনিকোঠায় এতটা জায়গা জুড়ে তার আধিপত্য বিস্তার করবে। এদেশে আগেও একবার আসার সুযোগ হয়েছিল -- সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য। গতবছর আবার সুযোগ এল Japan Foundationএর সৌজন্যে। পড়াশোনায় আমার বিষয় হল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। টোকিও ইউনিভার্সিটিতে গবেষণার কাজের সুযোগে দেশটি যেন পাকাপাকিভাবে আমার মনে জায়গা করে নিয়েছে। মনও যেন কখন এই রূপসী "নিপ্পন"কে অন্তর থেকে ভালবাসতে শিখেছে।

ফিরে যাই সেই 'একটা কিছু' র খোঁজে। মনটা এলোমেলোভাবে, আঁকাবাঁকা পথে খুঁজে চলেছিল। কেমনভাবে যেন সে চলে গেল মাতৃভূমিতে, যে ভূমিকে কোথাও কোনোদিন ভোলা যায়না। মন মনকে অবশভাবে বলে উঠল 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা'। এই লেখাটি লেখবার জন্য যখন এক দুর্বল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তখন সম্ভবত শরতকালের প্রকৃতির স্নিগ্ধ গন্ধ, বাতাস সীমানা পেরিয়ে বাংলার গ্রাম গঞ্জ শহরগুলোতে ধীরে ধীরে তার মোহময়ী আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছে। সূর্যের উজ্জ্বল মাধুর্য্য, তুলো পেঁজা মেঘের নিশ্চুপ চলাফেরা, শামুকখোলের ডানার ঝটপটানি , কাঠবেড়ালির অকারণ চঞ্চলতা, শিউলি আর কাশফুলের ডাক 'দ্যাখো আমি এসেছি' -- সবে মিলে এই পুজো -- আমাদের সবার সাধের পুজো -- দুর্গাপুজো।

পুজো কথাটার ভিতরেই কেমন একটা নস্টালজিয়ার বীজ লুকিয়ে আছে না ? কেমন একটা হারিয়ে যাওয়ার ভাব ? সারা বছরের সব ক্লান্তি, গ্লানি, দুঃখ, অভিমান যেন ধুয়ে মুছে শুদ্ধ হয়ে অজান্তেই মিশে যায় আনন্দের ধারায়। মনে পড়ে রবিঠাকুরের কথা – 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'। এই পরিবেশ আর কোনো উৎসবে হয় কি না জানিনা, তবে হয় শারদোৎসবে -- এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি। এটা এমন এক উৎসব যার মাঝে দাঁড়িয়ে মনে হয় সবাই আপন -- নেই কো কোনো পর, নেই কোনো ভেদাভেদ। মন তার নিজস্ব ছন্দে বলে ওঠে, সবার মঙ্গল কর হে ভগবান।

সময় কিন্তু তার নিজ খেয়ালে বয়েই চলে। আজ যে শিশু কাল সে কিশোর, আজ যে কিশোর কাল সে যুবক, যুবক হয় প্রৌঢ়, প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ -- এই চক্রেই ঘুরে চলে জীবন আর সংসার -- এগিয়ে চলি আমরা -- আমরা সবাই। এই এগিয়ে চলার পথে দু দণ্ড থমকে দাঁড়াই, পেছনে তাকাই, দেখি পুজোর সময়ের স্কুল-কলেজের অনাবিল আনন্দের দিনগুলো -- সে যেন সুখের ঝরনা। মহালয়ার সকাল থেকেই যেন পুজোর Core areaতে প্রবেশ। বান্ধবীদের ঘন ঘন ফোন, কত কত প্ল্যান, প্ল্যানের কাটাছেঁড়া, আবার নতুন প্ল্যান, কোনটা বেশী ভাল তার পর্যালোচনা। মৌ বলে, 'সিরাজ'এ খাবে তো মিমি বলে 'মেইনল্যান্ড চায়না', শ্রীলেখার আবার প্রথম পছন্দ 'ও ক্যালকাটা'। এই ভাঙাগড়া চলতে চলতেই এসে যায় ষষ্ঠির সন্ধ্যে ---শুধু হারিয়ে যাওয়ার পালা। এ যেন নিজের কাছেই নিজে হারিয়ে যাওয়া।

সন্ধ্যে হলেই ম্যাডাক স্কোয়ারের জমায়েতে সামিল হয়ে উদ্দাম আড্ডা -- কতশত কথা আর হাসির ফুলঝুরি -- মুহূর্তে বাতাসে মিলিয়ে যায়, আবার নতুন উচ্ছ্বাসের ঢেউ আছড়ে পড়ে। একটু বাদেই টাটা সুমোতে ঠাসাঠাসি করে এক প্যান্ডেল থেকে আরেক প্যান্ডেল -- যোধপুর পার্ক থেকে বাগবাজার। এরই মাঝে মাটন রেযালা আর রুমালী রুটি দিয়ে রসনার তৃপ্তি। এ যেন মাঝিহীন এক নৌকোকে ভাসিয়ে দেওয়া, যেখানে যায় যাক্। পরের দিনের সকাল যেন নতুন রঙ নিয়ে হাতছানি দেয়। হারিয়ে গেছে -- হায় ! সত্যিই যেন আর খুঁজে পাইনা সেই নানা রঙের দিনগুলি।

এখন পুজো আসে অন্যরকম রঙ আর স্বাদ নিয়ে। প্রকৃতি তার রূপ নিয়ে সাবলীলভাবে ঘুরে চলেছে তার নিজের কক্ষপথে, নিজস্ব নিয়মেই -- শুধু বদলে যায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। তাই বোধকরি অতীতের উচ্ছ্বাস-আনন্দের উৎস আজ আর তেমন ভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠার সাহস রাখে না; একইভাবে আজকের আনন্দের উৎস কাল আর সেভাবে নাড়া দিতে পারে না। এখন পুজোতে কলকাতায় থাকলে অষ্টমীতে চলে যাই বেলুর মঠে, মা বাবা আর ভাইএর সঙ্গ নিয়ে। দেখি কুমারী পুজো -- খুঁজে পাই আনন্দের উৎস।

গতবছর পুজোর সময় গিয়েছিলাম বাংলার বাঁকুড়াতে, পোড়ামাটির দেশে। ক'দিন থেকেওছিলাম নির্জনে নিভৃতে বাবা মা আর আমার ছোট ভাইটির সাথে। মুকুটমনিপুরের কংসাবতী প্রজেক্টের বাংলোটি এক পাহাড়ের চূড়ায় , অন্য দিকেও পাহাড় আর জঙ্গল। মাঝখানে কংসাবতী জলাধার -- শান্ত, নিস্তরঙ্গ, স্বচ্ছ জল। কি নির্জন ! মনে হয় নির্জনতারও একটা ভাষা আছে, সে ভাষাটি বড়ই দৃপ্ত। রাতে দূরের সাঁওতালি গ্রাম থেকে ভেসে আসত ধামসা-মাদলের শব্দ যেটা নির্জনতার গভীরতাকে কেটে জানান দিত ভয় নেই, আমরা আছি। প্রকৃতির এ এক অন্য রূপ। মনে পড়ে কবিগুরুর কথা –

‘বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরি
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু ।।’

ওই যে দূরের মেঠো পথটি পাহাড়ের গায়ে বাঁক নিয়েছে, হয়ত সেটি কোনো এক নাম না জানা ছোট্ট গ্রামে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে। ওই যে পথের ধারে না দেখা বুনোফুলটি ফুটে রয়েছে, তাকেও ঈশ্বর তাঁর নিজের হাতে সযত্নে রঙিন তুলির টানে অপরূপা করে তুলেছেন। যে প্রজাপতি পথ হারিয়ে রূপের টানে ফুলে এসে বসে আনন্দ আহরণের প্রচেষ্টায় মগ্ন, তাকে হয়ত আমরা দেখেও দেখিনা। অবাক হয়ে ভাবি, হে ঈশ্বর, তুমি কত নির্মল, শুদ্ধ, সুন্দর। তোমার বন্দনায় এ ভাষা -শব্দ যেন বড়ই দুর্বল, মলিন। ক্ষমা কর। ফুলের কথা তো শুনতে পাই না, সে তো শুনেছি অবলা। তবু কাছে যাই ধীর পায়ে, কান পাতি। ফিস্‌ফিস করে সে বলে ওঠে –‘ধন্য আমি মাটির পরে’। সে জানায় তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা সেই সর্বশক্তিমানের কাছে। আমরা জানাই প্রাণের শ্রদ্ধা -- প্রভু, তুমি লহ প্রণাম।

মোনা লিসা

(জাপানের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সোওসেকি নাৎসুমের লেখা
ছোটগল্প 'মোনা লিসা'র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)

- রুমা গুপ্ত

রবিবার এলেই ইবুকার ওই এক কাজ । গলায় মাফলার জড়িয়ে, কিমোনোর লম্বা হাতা টেনেটুনে নিজের হাতের তালু পর্যন্ত ঢেকে , বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে । পথে যত পুরোনো জিনিস বিক্রির দোকান , সবকটাতে একবার করে ঢোকা চাই , খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা চাই নতুন আর কি চালান এলো । ধুলো পড়া সবচেয়ে জীর্ণ-মলিন জিনিসের প্রতিই আগ্রহ বেশী, অর্থাৎ যেগুলো দেখলে মনে হয় কয়েক প্রজন্ম আগে লোকে ব্যবহার করেছে । তেমন কিছু নজরে এলে ইবুকা হাতে নিয়ে বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে । পুরোনো 'এ্যান্টিক' চেনার মত চোখ বা মান উপলব্ধি করার মত জ্ঞান ইবুকার নেই । তার উৎসাহ কম দামে কিছু পুরোনো অভিনব জিনিস সংগ্রহ করে বাড়িতে জমানো । এটাই তার নেশা , এতেই তার আত্মতৃপ্তি ।

গতমাসে ইবুকা ঢালাই করা লোহার কেট্‌লির একটা ঢাকনা কিনেছে পনেরো সেন দিয়ে । এখন সেটা কাজে লাগছে কাগজপত্র চাপা দিতে । এ মাসেরই আরেক রবিবার খুঁজে পেতে পঁচিশ সেন দিয়ে কিনে এনেছে ব্রোঞ্জের একটা পুরোনো তরবারির হাতল । সেটারও কাজ এখন কাগজপত্র চাপা দেওয়া । তবে আজ ইবুকা বড়সর একটা কিছু কিনতেই চায় । হাতে আঁকা ছবি বা ক্যালিগ্রাফি ! এক কথায়, এমন কিছু যা চট্ করে চোখে পড়ে । ইচ্ছে আছে পড়ার ঘরে সাজিয়ে রাখবে । বেশ কয়েকটা দোকান ঘোরার পর একটা দোকানে এসে এটা ওটা দেখছে, এমন সময় চোখে পড়ে ফ্রেমে বাঁধানো একটা রঙিন ছবি -- একজন পশ্চিমা নারীর প্রতিকৃতি । দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসিয়ে রাখা ছবিটাতে বিস্তর ধুলো জমেছে । কাছেই একটা পুরোনো ফুলদানি , তার মধ্যে থেকে হলুদ রঙ ধরে যাওয়া বাঁশীর একটা প্রান্ত বেরিয়ে এসে আড়াল করেছে ছবিটাকে ।

পুরোনো বিরল জাপানী জিনিসের দোকানে এই পশ্চিমা পেইন্টিং বিশেষ মানানসই না হলেও, এর রঙ যে জায়গায় জায়গায় বিবর্ণ হয়ে এসেছে, ইবুকা তা লক্ষ্য করে এবং ভাবে এই ছবি পুরোনো জিনিসের দোকান ছাড়া আর কোথায়ই বা স্থান পাবে ! 'দামও নিশ্চয়ই বেশী না'-- ভাবার পর যখন দেখে বুড়ো দোকানি এক ইয়েন চাইছে, তখন বিরক্ত হয়ে ওঠে । ওদিকে ছবিটা পুরোনো হয়ে গেলেও, ফ্রেমখানা এখনও শক্তপোক্ত , উপরের কাঁচও অক্ষত ! অনেক দরকষাকষির পর আশি সেন-এ ছবিটা কিনে নিয়ে ইবুকা বাড়ির দিকে পা বাড়ায় ।

পশ্চিমা নারীর প্রতিকৃতি বগলদাবা করে ইবুকা যখন বাড়ি পৌঁছালো তখন শীতের একটা দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা নেমেছে । ইবুকা সোজা গিয়ে ঢোকে পড়ার ঘরে । ঘরটা অন্ধকার । তাড়াতাড়ি মোড়ক থেকে ছবিখানা বের করে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখে । তারপর চুপচাপ সামনে বসে এই ছবি নিয়েই ভাবতে থাকে । এমন সময় আলো হাতে স্ত্রী ঘরে ঢুকলে, ইবুকা তাকে আলো ফেলতে বলে আবার খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করে সদ্য আশি সেন দিয়ে কিনে আনা সম্পত্তিটি । বিবর্ণ অনুজ্জ্বল ছবি, নারীর মুখমণ্ডল ছোপধরা ফ্যাকাসে হলদে । ইবুকা ভাবে, এ নিশ্চয়ই অনেক পুরোনো হয়ে যাওয়ারই পরিণাম । স্ত্রীর দিকে ফিরে জানতে চায়, 'কেমন লাগছে ?' আলোটা তুলে ধরে ছবির ফিকে হল্‌দে রঙের দিকে একটু তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নেয় স্ত্রী, 'ভীষণ অস্বস্তিকর, তাকাতে পারছিনা ।' স্ত্রীর কথায় একটুও গুরুত্ব না দিয়ে ইবুকা হেসে বলে, 'মাত্র আশি সেন দাম ।'

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর ইবুকা ছোট টুলের উপর দাঁড়িয়ে পড়ার ঘরের একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গাতে পেরেক পুঁতে ছবিটা টাঙ্গিয়ে দেয় । স্ত্রী-র প্রবল আপত্তি, বার বার বলতে থাকে এই ছবি বাড়িতে রাখলে কি ঘটবে কিছুই বলা যায় না । ইবুকা কর্ণপাত করে না ।

হাল ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী সেখান থেকে সরে গিয়ে বসে চা খাওয়ার ঘর চা-নো-মা-তে । পড়ার ঘরে ইবুকা তখন কলম হাতে ঘাড় গুঁজে নিজের কাজে মন দিয়েছে । মিনিট দশেক পরে হঠাৎ ঘাড় তোলে সে । ইচ্ছা আরেকবার ছবিটা দেখবে । হাতের কলম রেখে তাকায় ইবুকা, ছবিটার উপর চোখ বোলায় --বাঁ দিক থেকে দৃষ্টি গড়ায় ডান দিকে, আবার ডান দিক থেকে বাঁ দিকে । ছবিতে ফ্যাকাসে হলদে রঙের নারীর ঠোঁটে সামান্য হাসি ফুটে উঠলো যেন ! ইবুকার দৃষ্টি আটকে গেল সেখানেই । এটা বোধহয় চিত্রকরের হাতের গুণ ! ছবির আলো-ছায়াকে ব্যবহার করে তিনি দর্শকদের ধন্ধে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন । নারীর সরু ঠোঁটের দুটি কোণা এমনভাবে তোলা যে গালে আবছা টোল পড়েছে । এই নারীর বন্ধ ঠোঁটের দিকে তাকালে মনে হয় বুঝি এক্ষুণি খুলে যাবে, অথবা এক মুহূর্ত আগেও খোলা ছিল আংশিকভাবে, কোনো কারণে বন্ধ হয়েছে । কেন জানি ইবুকা হঠাৎ একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো । জোর করে আবার মনটাকে টেনে আনলো কাজে ।

কাজ বলতে এমন কাজ নয় যে খুব মনোযোগ দাবি করে । অতএব দু-এক মিনিট কাটতে না কাটতেই আবার মাথা তোলে ইবুকা এবং ছবিটার দিকে তাকায় । এই ঠোঁট একটা কিছু গোপন করছে নিশ্চয়ই । মুখে অবশ্য প্রশান্তির ছায়া । এমন সময় খোলা দুটি চোখের মণি যেন হঠাৎ নড়ে উঠে শান্ত দৃষ্টি বুলিয়ে দেয় সারা ঘরে ! ইবুকা তাড়াতাড়ি আবার মাথা নামিয়ে কাজে মন দেওয়ার চেষ্টা করে ।

এরপর আরও কয়েকবারই ছবিটার দিকে চোখ গেছে ইবুকার এবং মনে মনে ভেবেছে স্ত্রী-র কথাটা বোধহয় ভুল নয় । তবে এই বিভ্রান্তির বিষয়ে স্ত্রীকে সে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় না । পরদিন সকালে অন্য আর যে কোনো সোমবারের মতই ইবুকা কাজে গেল । বেলা চারটে নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখে ছবিটা টেবিলের ওপর উল্টো করে রাখা । স্ত্রী জানায় দুপুরের পর হঠাৎ ছবিটা

দেওয়াল থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। বলাইবাহুল্য উপরের কাঁচ ভেঙে চুরমার। দড়ি বাঁধার হুকগুলো ফ্রেম থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছে, যার কারণ স্পষ্ট নয়। ইবুকা ফ্রেম থেকে ছবিটা বের করে আনে। একটি পশ্চিমা সাময়িক পত্রিকা চার ভাঁজ করে ছবিটার পেছনে লাগানো। পত্রিকাটি মেলে ধরতেই ইবুকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি নিবন্ধ যার এক অংশে লেখা --- 'মোনা লিসার মুখে আত্মগোপন করে আছে নারী-হৃদয়ের চিরন্তন সত্তা। মানব সভ্যতার ইতিহাসে লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি-ই একমাত্র শিল্পী যিনি এই প্রহেলিকাকে চিত্রকর্মে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। তবে আজ পর্যন্ত কেউ নারী-হৃদয়ের গোপন রহস্য ভেদ করতে পারেনি।'

এর পরদিন ইবুকা কর্মস্থলে গিয়ে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করে, মোনা লিসা কে ? কেউ জানেন না। লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি-ই বা কে ? এরও উত্তর জানা নেই কারুর। বাড়িতে স্ত্রীর মুখে এক কথা -- এ ছবি রাখলে কি ঘটবে কিছুই বলা যায় না।

শেষপর্যন্ত ইবুকা স্ত্রীর পরামর্শ মেনে ছবিটা বিক্রি করে দিল পুরোনো কাগজ কিনতে আসা এক লোকের কাছে পাঁচ সেন-এর বিনিময়ে।

গবেট কোথাকার

- গৌতম সরকার

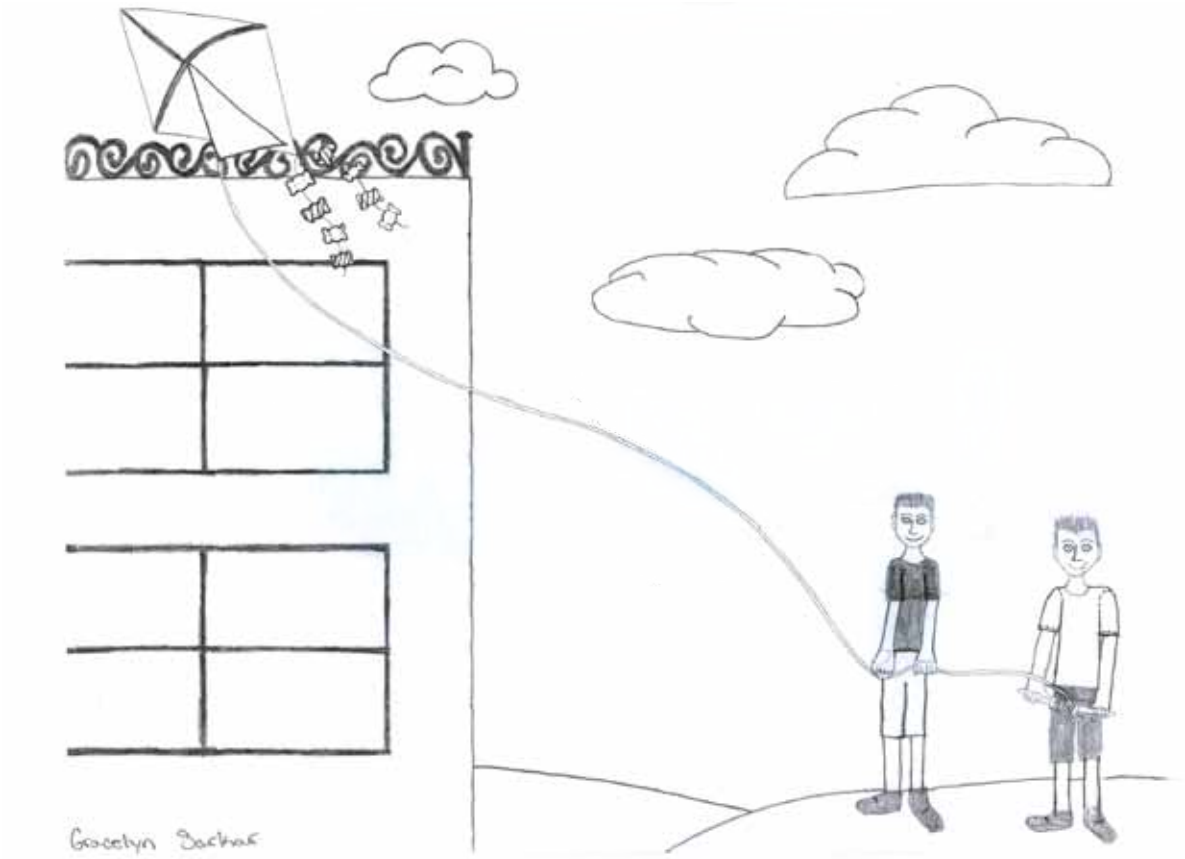

খবরের কাগজে, মানে আনন্দবাজারের ইন্টারনেট সংস্করণে, বিশ্বকর্মা ঠাকুর আর ঘুড়ি-লাটাই-এর ছবি দেখে মনটা যেন কেমন করে উঠলো। এই মার্কিন মুলুকে বসেও মনে হল --- আচ্ছা, ছাদে উঠে একটু ঐ লাটাইয়ের সুতোয় টান মারলে হত না ?

ছাদ। মানে আমাদের বালিগঞ্জের বাড়ির ছাদ আর কি, মানে যেখানে বড় হয়েছি।

ভোকা --- ট্টা ! কান ফাটানো চিৎকারে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

--- মানু , তুই কি সারাটা জীবন 'গবেট'ই থেকে যাবি ? লাটাইটা ধরতে শেখ। দাদার ধমকানিতে যেন একটু সম্বিত ফিরে পেলাম। দেখি, দূরে উঁচুতে আমাদের ঘুড়িটা কেটে আকাশে ভেসে যাচ্ছে।

--- নে, আর ক্যালাকান্তিকের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিস না।

আমি তখনো থতমত। এটাই যে ছিল আমাদের শেষ ঘুড়ি ! বাকিগুলো যে সবই ছেঁড়া-ফাটা।

--- কিরে ? সুতোটা গোটাবি, নাকি বুবুদাকে ডাকবো লাটাই ধরার জন্যে ?

আমি ভয়ে প্রাণপণে লাটাই ঘোরাতে শুরু করি। একে তো মাঞ্জা মারার সময় দাদা আমাকে পাত্তাই দেয় না, সবই করে ঐ বুবুদা আর ঘোন্টুদার সাথে , তার ওপর আমার যদি এই লাটাই ধরার কাজটাও যায়, তাহলে লাইফে আর কি থাকলো ? আর পাশের বাড়ির ঝুম্পু বা রূপারা যদি এটা জানতে পারে, তাহলে ? তাহলে তো প্রেস্টিজ পাংচার ! আমি প্রাণপণে লাটাই ঘোরাতে থাকি। কিন্তু এবার ? এবার কি হবে ? পকেট গড়ের মাঠ। বাকি ঘুড়ি সব ছেঁড়া। বিকেলটা কাটবে কি করে ? গঁদের আঁঠাটা পর্যন্ত গেছে। ছেঁড়া ঘুড়িগুলো একটু সাঁটবো তারও উপায় নেই। কি হবে ?

--- শোন্।

দাদার গলা শুনে একটু আশ্বাস পেলাম।

--- নিচে যা। মায়ের কাছ থেকে ভাত ম্যানেজ করে আনতো। ওতেই ছেঁড়া ঘুড়িগুলো সাঁটবো। আর শোন্, একটু খবরের কাগজ ছিঁড়ে আনবি। ভেতরের পাতাটা ছিঁড়বি, বুঝলি ? গবেট কোথাকার !

দর্ দর্ করে ঘামতে ঘামতে আমি তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম, বোতাম ছেঁড়া হাফ-প্যান্টটা কোনোরকমে সামলে; যাতে খুলে পড়ে না যায়। যে করেই হোক, লাটাই ধরার কাজটা আমার বজায় রাখতেই হবে।

'বাজলো তোমার আলোর বেণু' । ঐ তো, রেডিওতে মহালয়া শোনা যাচ্ছে । কিন্তু আমি উঠবো না । আমার এভাবেই শুয়ে থাকতে খুব ভাল লাগছে । মা-কে পাশ-বালিশ করে এভাবেই আমার শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে । মা-র গায়ের উত্তাপ, আর মা-র গায়ের গন্ধ, দুটোই আমার খুব ভাল লাগছে । মায়ের শাড়ীতে, আঁচলে, যখন মুখ মুছি; আমি তখন ঠিক এই গন্ধটাই পাই । আচ্ছা, এটা কি রসবড়ার গন্ধ ? নাকি কাল বিকেলে যে ডালপুরি করেছিল, তার ? নাঃ, এটা বোধহয় সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া এক গন্ধ, আমার মায়ের গন্ধ । আমার ভাল লাগছে ।

'ওগো আমার আগমনী ।' মহালয়া কি শেষ হতে চললো ? আজ বাবা আসবে, ঐ যে, উলুবেড়িয়া না দুর্গাপুর; কোথা থেকে যেন । নাকি আসানসোল ? ঐ বোটানিকাল গার্ডেনস্-এর পাশের কলেজটায়, ঐ যে শিবপুর না কোথায় যেন; ওখানে যারা পড়াশোনা করে, তাদের নাকি ঐ দুর্গাপুর না আসানসোল; কোথায় যেন যেতে হয় । তাই নাকি বাবাকেও ওদিকেই থাকতে হয় সারা সপ্তাহ । মা-র খুব দুঃখ তাতে । মা সারা সপ্তাহ তাকিয়ে থাকে এই দিনটার দিকে, বাবা কবে আসবে । সেদিন মা-কে অন্যরকম দেখায় । সেদিন মা ভাল ভাল খাবার বানায় । আচ্ছা, মা কি আজ মালপোয়া বানাবে ?

--- মা, ও মা, আজ কি তুমি ---

--- আঃ, বাবা; সরে শো, একটু সরে শো । আটু হলেই তো খাট থেকে পড়ে যাচ্ছিলি বাবা ।

--- আচ্ছা মা, বাবা এলে আজ আমরা কি কি করবো ?

--- প্রথমেই ওঁকে প্রণাম করে নেবে । তোমাদেরও ওঁর মত লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হতে হবে কিনা !

--- তা মা, বাবা কিন্তু লেখাপড়ার নামে অনেক ছবি আঁকে ।

--- ছবি আঁকে ?

--- হ্যাঁ মা, কি সব হাতির শুঁড়ের মত । একবার জিজ্ঞেসও করেছিলাম । তা বাবা বললো ওই দিয়ে নাকি অঙ্ক কষা যায় । সত্যি ?

--- সত্যি বৈ কি । তোদের বাবা কোনো কথা মিছি মিছি বলে না ।

কিরিং কিরিং !! ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠলো কলিং বেলটা । ঐ যে বাবা এসে গেছে । এবারে আর খাট ছেড়ে উঠতে খারাপ লাগলো না । প্রণাম করতেই,

--- থাক্ থাক্, হয়েছে । ট্রেনের ধুলো-বালি মেখে এলাম ---, কিরে গানটা তুলেছিস তো ?

--- কোন্ গানটা বাবা ?

--- এই তো ? আবার ভুলে মেরে দিয়েছিস্ ? ঠিক আছে, দাঁড়া । আমি হাতমুখটা একটু ধুয়ে নিই --

তার পরেই বাবার গলার সেই স্বর, কবিগুরুর সে-ই সুর ।

'তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই' । মুহূর্তে সময় যেন দিশা হারালো ।

ক্যাঁক -ক্যাঁক, ক্যাঁক-ক্যাঁক, ক্যাঁক-ক্যাঁক -----

--- আচ্ছা বাবা, হারমোনিয়ামটা এরকম বিদঘুটে আওয়াজ করছে কেন ?

--- কোই, না তো, ঠিকই আছে । নে ধর ---- 'মনোহরণ চপলচরণ সোনার হরিণ চাই ।'

--- হ্যাঁ বাবা, শুনে দেখ ।

ক্যাঁক-ক্যাঁক, ক্যাঁক-ক্যাঁক, ক্যাঁক-ক্যাঁক ----

--- 'Baba, Baba, Baba, wake up. Your alarm is going off.'

--- Okay, okay . Thanks Gracie-Ma.

ক্যাঁক-ক্যাঁক, ক্যাঁক-ক্যাঁক, ক্যাঁক-ক্যাঁক ---- বিছানায় বসে আছি । আজ আর এ্যালার্মটা বন্ধ করতে মন সরছে না । যদি সময়টা ধরে রাখা যায় !

--- Let's get moving Baba . I am done with my shower , it's your turn . Why are you being so slow this morning ?

--- Yes, Gracie-Ma, I am just---, I was just ---

--- Okay, okay, let's go. otherwise we will be late for the school .

সত্যিই তো, আমারই ভুল ! সময় কি কখনো ধরে রাখা যায় ? সময় কি কখনো দিক ভোলে ? গবেট কোথাকার !

চোখ কচলে পাশের ঘরে গিয়ে দেখি আমার Maya-মা আর Katie-মা তখনো ঘুমিয়ে চলেছে অঘোরে । আচ্ছা, ওদের যদি আজ না তুলি ? আজ যদি --- আজ যদি কাজে না যাই ? আজ যদি মালপোয়া করে খাই ? তাও কি হয় ? এ যে মার্কিন মুলুক । আজ মহালয়া তো কি ? গবেট কোথাকার !

ক্ষুদ্‌দার ব্যাংকক ভ্রমণ

- অনুপম গুপ্ত

ক্ষুদ্‌দার অনেক সমস্যার মধ্যে একটা সমস্যা হচ্ছে ছেলেদের অত্যাচার। আসলে এটা হোল ভালবাসার অত্যাচার। জাপানে Golden Week না কি যেন বলে, সেই ছুটিতে ওনারা Bangkok যাবেন, সঙ্গে বাবা মাকেও যেতে হবে। রমলা বৌদি খুব উৎসাহিত। কিন্তু ক্ষুদ্‌দাকে দু দিক সামলাতে হয়। বিদেশ ভ্রমণের অদেখা ঝামেলার সঙ্গে স্কুলবুদ্ধিসম্পন্না রমলা চাকলাদারকে একটু modern করার ব্যর্থ প্রয়াসের সমস্যা।

গত ৩রা মে ২০১১। Air Asia-র দুপুরের flight, দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে কলকাতা থেকে যাত্রা করে বিকেল ৫টা ৫ মিনিটে (Bangkok time) Bangkokএর সুবর্ণভূমি বিমানবন্দরে ক্ষুদ্‌দা সস্ত্রীক পৌঁছালেন। রমলা বৌদি হঠাৎ দেখতে পেলেন একজন স্থানীয় কর্মী "ক্ষুদিরাম চাকলাদার" লেখা একটা কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৌদি বললেন, "দ্যাখো, তোমার মত নামের লোক এখানে আরও আছে।" ওই লোকটা যে ক্ষুদ দার জন্য অপেক্ষা করছে সেটা বৌদির বোধগম্য নয়। সেখান থেকে Travel Agent এর সাহায্যে Thailandএর Pattaya শহরে পৌঁছলেন, যেখানে দাদার পরিবারের অন্যান্যরা অপেক্ষা করছে।

Pattaya শহরে বিলাসবহুল ঝাঁ চক্‌চকে একটা হোটেলে ওঠা হল। হোটেলটি অবিকল জাহাজের মত দেখতে। নাম "A-One Royal Hotel Cruise" যেখানে "Bye Bye Bangkok" সিনেমার বেশীর ভাগ shooting হয়েছিল। বৌদি তো হোটেলে ঢুকতেই পারছিলেন না -- polished floorএ হিলতলা জুতো পরে পা হড়কে যাচ্ছিল। তবে Bye Bye Bangkok সিনেমার কথা শুনে নিজে বর্তমানের উঠতি নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন, যদিও ক্ষুদ্‌দা নিজে কাঞ্চন, খরাজ, ইন্দ্রনীল হওয়ার কথা ভাবতেই পারেন নি।

সকালে breakfast খেতে গিয়ে আর এক বিড়ম্বনা। অত রাশি রাশি খাদ্যদ্রব্য নাকি free, পয়সা লাগে না। এও আবার হয় নাকি ? সেবারে যখন তারাপীঠে গিয়ে 'জয় মা তারা হোটেল'এ দাদা বৌদি উঠেছিলেন, কই পরদিন সকালে তাদের তো কেউ বিনা পয়সায় breakfast খাওয়ায় নি ! কচুরি জিলিপি তো পয়সা দিয়েই কিনতে হয়েছিল। Four Star, Five Star হোটেলে নাকি এইরকমই নিয়ম -- breakfast free। হোটেলের সাথে starএর কি সম্পর্ক বৌদি বুঝতে পারছেন না। Star মানে তো সিনেমার নায়ক-নায়িকা, মানে মিঠুন চক্রবর্তী, অমিতাভ বচ্চন, কারিনা, ঐশ্বরিয়া। দাদা চাপা স্বরে বৌদিকে উপদেশ দিলেন অত তারকাদের চিন্তা না করে breakfastএর দিকে নজর দিতে। এত খাবার বৌদি জীবনে দেখেন নি। কোন্ দিক থেকে শুরু করতে হয় কে জানে ! একবার এক বিদেশিনীকে ধাক্কা দিলেন, একবার প্লেট এবং দু বার কাঁটা-চামচ মাটিতে ফেললেন। গরম চা ও ঠাণ্ডা ফলের রস পর পর খেলেন। ক্ষুদ্‌দা বৌদিকে মনে করিয়ে দিলেন, বৌদির হজমের দায়িত্ব Thai Government বা হোটেল কর্তৃপক্ষ নেবে না। ওখানে চট্ জলদি ওষুধও পাওয়া যায় না।

প্রাতরাশ খাওয়ার পরে swimming poolএর ধারে বসা হোল। বৌদির চোখ তো কপালে ওঠার জোগাড়। একি কাণ্ড ! বিদেশিনীরা minimum পোশাক পরে জলে নেমে সাঁতার কাটছে ! এদের রঙ যতই ফর্সা হোক -- এদের কি লাজ-লজ্জা বলে কিছুই নেই ? এদের শ্বশুর শ্বাশুড়ি ননদ ভাসুররা কি কিছু বলে না ? এখানে আর এক মুহূর্তও থাকার দরকার নেই। যদিও বৌদির পরিবারে আর সকলে খুবই উপভোগ করছে, নীল জলে সাঁতার কাটছে। কিছুক্ষণ পরে ঐ দৃশ্য চোখে সয়ে গেল এবং বৌদির জলে নামার একটু ইচ্ছা হোল। কিন্তু তাকে জানানো হোল শাড়ী জামা কাপড় পরে poolএ নামার নিয়ম নেই। অগত্যা উল্টোদিকে সমুদ্রে বৌদিকে নিয়ে দাদা গেলেন। ওখানেও কিন্তু বৌদির পক্ষে চক্ষুপীড়াদায়ক দৃশ্য প্রচুর আছে। বৌদির ভাষায়, "ঐ মেয়েছেলেগুলো" বালির ওপর শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। ক্ষুদ্‌দা বললেন বিদেশের ছেলেমেয়েরা

এইরকম করে, একে বলে sun basking । বৌদির তাৎক্ষণিক ক্ষোভ উদ্‌গীরণ, নিজের দেশেই তো ওরা রোদ পোয়াতে পারে । এত দূরে এসে সকলকে লজ্জা দেওয়ার কি দরকার ? যাইহোক, শাড়ী পরেই বৌদি সমুদ্রে নামলেন, এবং একটা মগে জল নিয়ে মাথায় ঢেলে স্নানপর্বটি সম্পন্ন করলেন, যদিও তার নাতনি ফুচা হেসেই কুটিপাটি । দুই প্রজন্মের gap, হাসবে তো বটেই ।

দ্বিপ্রাহরিক আহার অন্য একটা হোটেলে সারা হোল । বৌদি সকালে breakfast যা খেয়েছিলেন, দাদা ভেবেছিলেন কলকাতায় ফেরার আগে বৌদির বোধহয় খাওয়ার আর প্রয়োজন হবে না । Lunchএ হয়তো বৌদি দু-একটা শশার টুকরো খেয়েছিলেন, কিন্তু মুশকিল হোল পান, জর্দ্দা একদম নেই । জর্দা সঙ্গে এনেছিলেন , কিন্তু Bangkok Airport-এ customs checking-এর সময় banned item (জর্দ্দা) ফেলে দিতে হয়েছিল । ভারত সরকারের নাকি উচিত Thai Governmentএর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করা । ক্ষুদ্‌দা অবশ্য ভাবলেন পান-জর্দ্দার প্রচলন নেই বলেই থাই সরকারী ভবনের দেওয়াল এত সুন্দর, পরিষ্কার, পানের পিকের কোনও দাগ নেই । কলকাতার সরকারী ভবনের একমাত্র পরিচিতি পানের লাল পিকের দাগ ।

পাটায়া (Pattaya) শহরের আলো ঝল্‌মল দোকান দেখতে বের হলেন সবাই । রাত ৯টার পরে দাদা-বৌদিকে পাঠানো হোল একটা জায়গায় যার বিখ্যাত নাম Walking Street । এখানে গাড়ী চলে না, শুধুই হাঁটার রাস্তা । রাস্তার দু দিকে আলোর রোশনাই, নাইট-ক্লাবগুলোর উগ্র প্রতিযোগিতা । উঁচু scaleএ বাঁধা music এবং সঙ্গে উদ্দাম নৃত্য । ঐ বাজনার তালে তালে দাদার পা-ও যে একটু দুলছিল না, তা নয়, কিন্তু দাদার প্রতি বৌদির কড়া নজরদারীও ছিল । বেচারা নিপীড়িত, নির্যাতিত, অবহেলিত পুরুষ সমাজ ! রাস্তার দু-দিকে, একবার বাঁ দিকে একবার ডান দিকে, আবার বাঁ দিকে আবার ডান দিকে তাকাতে তাকাতে দাদার মস্তকটি ধর থেকে খুলে পড়ার জোগাড় । বৌদি আর কতভাবে তাঁর স্বামীকে সামলাবেন ? যদিও ক্যামেরাটা আগেই দাদার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন, তবে একটা ভুল হয়েছে, swimming pool ও sea beachএ যাওয়ার আগেই ক্যামেরাটা দাদার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া উচিত ছিল । ক্যামেরা আবিষ্কারের কি দরকার ছিল, কে জানে !

পাটায়া শহরে বিদেশের retired and single লোকেদের নাকি খুব demand, কারণ তাদের পয়সা আর ফূর্তি করার ইচ্ছা -- দুইই আছে । বৌদি দাদাকে তাঁর বাহুলগ্না করে হাঁটছিলেন যাতে কুদৃষ্টি বা অশুভ নজর না লাগে । কপালে কাজলের টিপ দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছাও হয়তো ছিল, কিন্তু নাতনি ফুচার জন্য সেটা হোল না । তবে বাহুলগ্না স্ত্রী, মানে চল্লিশ বছর আগেকার স্মৃতি । মন্দ কি !

পরের দিন সকালে সবাই মিলে একটা speed boatএ উঠে Coral Islandএ গেলেন । Boat দুরন্ত গতিতে চলার জন্য পেছনে জলরাশিতে ফেনার উদ্ভব হচ্ছিল । তাকালে ভয় পাওয়ারই কথা । বৌদি ভয়ে চোখ বন্ধ করে ছিলেন । হয়তো ভাবছিলেন স্বর্গে একা যাবেন না, মাঝ সমুদ্রের ভেতর দিয়ে দাদাকে সঙ্গে নিয়েই যাবেন । সেই জন্যেই কিনা জানা নেই, বৌদি দাদার হাত এত শক্ত করে চেপে ধরেছিলেন যে তিন চার ঘন্টা পরেও দাদার হাতের রক্ত চলাচল বন্ধ ছিল । Speed boatএর glass bottom দিয়ে সমুদ্রের মাছ দেখার কথা । কিন্তু চোখ বন্ধ থাকলে মাছ দেখা যাবে কি করে ? নাতনি ফুচার কি হাসি !

ক্ষুদ্‌দার কাছে কত মজার মজার গল্প শোনা গেল, শেষ নেই । যেমন, Bangkokএ ফিরে এসে সকলে massage(spa) করাতে গেল । বৌদি কিছুতেই গেলেন না । এই বয়সে একমাত্র orthopedic surgeon ছাড়া অন্য কাউকে তিনি অঙ্গ স্পর্শ করতে দেবেন না । Bangkok শহরের বিখ্যাত Jem Factory-তে যাওয়া হোল । হীরে জহরত সহ প্রচুর গয়নাও দেখা হোল । তবে ঐ একটা জায়গায় দাদা বেঁচে গেলেন, কারণ দাদার শর্তই ছিল যা কিনতে চায় সেটা salesmanকে সোজাসুজি বলতে হবে । বৌদি মনে মনে বললেন, এর থেকে কলকাতার P.C.Chanda, Anjali Jewellers অনেক ভাল ।

৮ই মে সকালে ছেলেরা জাপানে চলে গেল । দাদা বৌদি সকালের flight-এ কলকাতায় ফিরে এলেন । দাদা ভাবেন বৌদির intellect level টা চল্লিশ বছর আগে যা ছিল আজও ঠিক তাইই আছে । এতদিনে যখন বাড়েনি, আর কি বাড়বে ? মনে তো হয় না । তবে ক্ষুদ্‌দার একঘেয়ে ক্লান্তিকর জীবনে রমলা বৌদি এক মরুদ্যান, Oasis .

Bangkok ভ্রমণের সুখস্মৃতি বিজড়িত পারিবারিক ছবিগুলো computerএ upload করে দাদা নিজে দেখেন, অন্য সকলকে দেখান এবং বলাইবাহুল্য আনন্দ পান । ক্ষুদ্‌দার সঙ্গে বৌদি বিদেশে বেড়াতে যান বলেই তো ক্ষুদ্‌দা ভ্রমণ রচনা লিখে এত আনন্দ পান ।

সাকুতারো ও জীবনানন্দের অনুধাবন কাব্য

- মাসাইউকি উসুদা

সাকুতারো হাগিওয়ারা

হত্যাকাণ্ড

দূর আকাশে পিস্তলের শব্দ।
আবার পিস্তলের শব্দ।
আহ্ কাঁচের জামা পরে ডিটেক্‌টিভটি আমার
প্রেমিকার জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ল গোপনে,
মেঝেটা স্ফটিকে বাঁধা,
অঙ্গুলি আর অঙ্গুলির মধ্য দিয়ে
সুনীল রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে,
করুণ নারীর শবের উপরে
হিমশীতল 'কিরিগিরিস্' পোকা ডাকছে।

প্রথম হেমন্তের কোনও সকালবেলা,
কাঁচের জামা পরা ডিটেক্‌টিভটি
ঘুরল শহরের চারমাথার মোড়।
সেইখানে শরতের ফোয়ারার উৎসারণ।
এমনই একা ডিটেক্‌টিভটি অনুভব করে বিষন্নতা।

দেখ, দূরে নিরালা মর্মরের ফুটপাথ দিয়েই,
দুদ্দাড় করে পালিয়ে যাচ্ছে অপরাধীটা ।।
(রচনাকাল আগস্ট ১২, ১৯১৪)

কাব্যগ্রন্থ 'চাঁদকে ডাকা' (১৯১৭)-র অন্তর্গত এই কবিতার রচয়িতা সাকুতারো হাগিওয়ারা (১৮৮৬-১৯৪২) আধুনিক জাপানী কবিতার ইতিহাসে একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। আসলে তিনি বর্তমান জাপানী কবিতার ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। এই কারণে তাঁর সঙ্গে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯--১৯৫৪)-এর তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব।

বাংলায় আধুনিক কবিতার প্রাসাদ নির্মাণ করেন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। আধুনিক জাপানে রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য কেউ জন্মাননি। তবে বর্তমান বাংলা কবিতা শুধু রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়ে তোলা সম্ভবপর ছিল না। রবীন্দ্রনাথ থেকে বর্তমান কবিতার দিকে অগ্রসর হতে একটা মোড় ঘোরানোর প্রয়োজন ছিল। সেই প্রচেষ্টার মাঝখানে নির্দ্দিষ্ট করা যায় জীবনানন্দের কবিকীর্তি।

দুজন কবির মধ্যে বিস্তারিত তুলনামূলক আলোচনা অবশ্য এই লেখার ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। সাকুতারোর এই কবিতার সঙ্গে জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতাটির বিষয়গত মিল থাকায় সেটি নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।

'হত্যাকাণ্ড' সম্বন্ধে প্রথম জিজ্ঞাস্য বিষয় হল এই যে, কে বা ডিটেক্‌টিভ আর কেই বা অপরাধী। সমালোচক তেৎসুতারো কাওয়াকামি (১৯০২-১৯৮০)-র মতে ডিটেক্‌টিভ আর অপরাধী অভিন্ন, যদিও এ ব্যাপারে কোনও প্রমাণের কথা তিনি উল্লেখ করেননি।

অন্যদিকে কবি-সমালোচক তাকায়াকি ইয়োশিমোতো (১৯২৫ --)-র মতে কবিতার উপরের অংশটি দেখলে মনে হয়, কবির প্রেমিকার ওপর অন্য কাউকে দিয়ে কামনা চরিতার্থ করান হয়েছে, যাকে কবি ডিটেক্‌টিভ হয়ে অনুধাবন করছেন। আসলে কবি শুধু নিজের কামনাকে ধমনীর কম্পমান নকশা দিয়েই চিত্রিত করেছেন মাত্র।

কোন্ মতটি শ্রেয়তর বিবেচনা করতে গেলে তাঁর রচিত অন্য কবিতা 'চাঁদ আর জেলি-ফিশ' দ্রষ্টব্য। সেই কবিতায় শিকার সম্পন্ন হয় 'আমি' (স্বয়ং কবি) ও জেলি-ফিশের মধ্যেই।

'আমার' (কবির) হাত শরীর থেকে পৃথক হয়ে জেলি-ফিশের অনুসন্ধানের জন্য প্রলম্বিত হয়। এই হাতটা 'হত্যাকাণ্ড'-র ডিটেক্‌টিভের ছাড়া কিছু নয়। ডিটেক্‌টিভটি 'আমি' (কবি) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হত্যার ঘটনাস্থলে ধাবমান। জেলি-ফিশ হচ্ছে তাঁর কামনার লক্ষ্য।

'চাঁদ আর জেলি-ফিশ' কামনা বিনাশের ইচ্ছার কাহিনী, অন্যদিকে 'হত্যাকাণ্ড' তো কামনা ও পলায়নের অন্তহীন পুনরাবৃত্তির পালা। তবে কবি সেই হতাশার সত্যতা পুরোপুরি মেনে নিয়েছেন বলে এমন একটি স্বচ্ছ ছবি আঁকতে সক্ষম হয়েছেন।

'হত্যাকাণ্ড'-এ অপরাধটা 'আমি' করিনি, ঘটিয়েছে অপরাধীটা। এই লোকটা কে ? এ অবশ্য 'সচেতন আমি' নয়, বরং 'চেতনার নিচে চাপান আমি', অর্থাৎ 'আমি'র অজ্ঞাত আংশিক সত্ত্বা , সংক্ষেপে 'অবচেতন আমি'।

'আমি'র সচেতন ও অবচেতন মন, এই দুটো স্তরের মাধ্যমে ডিটেক্‌টিভ ও অপরাধীর অভিন্নতা কোনমতে প্রমাণিত হয়েছে। কবিতার চিত্রণও স্ফটিকপ্রতিম সুন্দর হয়েছে। তা সত্ত্বেও হত্যাকাণ্ডের আসল সমাধান এখনও হয়নি, বরং অপরাধীর মত পালিয়ে যাচ্ছে এবং ডিটেক্‌টিভটি কি করা যায় তা স্থির করতে না পেরে জটিলতার মোড়ে দাঁড়িয়ে শুধু বিষন্নতাই অনুভব করছে।

জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতার বিষয়ও শিকারী ও শিকারের অনুধাবন কাহিনী। 'হত্যাকাণ্ড' যেমন যৌনতাসংক্রান্ত, 'ক্যাম্পে'ও তেমনই সেই পরিবেশই লক্ষ্য করা যায়। আমার মনে হয় যে এই কবিতার মর্ম নিম্নে উল্লেখিত চরণের মধ্যে প্রদত্ত। 'প্রেমের সাহস-সাধ-স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই; পাই না কি ?' (৭৮-৭৯) এই দো'টানা প্রেমের সক্রিয়তা কবিতাখানিতে বন-জগতের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। তা ছাড়া সময়ও যখন বিশেষ করে 'বসন্তের রাতে' 'বসন্তের জোৎস্নায়' 'দখিনা বাতাসে' পরিপূর্ণ, তখনই এই পরিবেশে গতানুগতিক নিয়মকানুন উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। হিংস্র বাঘ-চিতাদের মৃগীর রূপ দেখে বিস্ময় জেগেছে (৩০) আর তারা হরিণদের শিকার করতে যেন ভুলে গেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে সমস্ত বনটা বৃন্দাবনের প্রেমকাননে পরিণত হয়েছে। সুতরাং হরিণেরা মৃগীর ডাক শুনে বাঘ-চিতাদের ভয় ভুলে অগ্রসর হয়েছে।

তবে বৃন্দাবনের সব ঘটনাই প্রত্যক্ষ নয়। সেই জন্যেই কবি 'বনের মধ্যে না ঢুকে, কাছে রয়েছেন, শিকার করছেন না, ক্যাম্পে আছেন।' (ক্ষেত্র গুপ্ত, জীবনানন্দ; কবিতার শরীর , পুস্তক বিপনি, ২০০০, পৃঃ ৯৭)

বনে আর বনান্তরে সম্পন্ন সমগ্র অনুধাবন নাটকের কাঠামো এই রকম -- চরিত্রের সংখ্যা 'হত্যাকাণ্ড'-র চেয়ে একজন বেশি। 'হত্যাকাণ্ড'-এ ডিটেক্‌টিভ, অপরাধী ও 'আমি' (কবি), তবে 'আমি'র অস্তিত্ব হাল্‌কা। এদিকে 'ক্যাম্পে'-তে শিকারী, হরিণ, মৃগী, মৃগী আর 'আমি' (কবি)। ফলে অনুধাবন পালা আরও জটিল হয়েছে।

'ক্যাম্পে' কবিতায় 'আমি' অর্থাৎ কবির সঙ্গে বাকি তিন চরিত্রের অভিন্নতা লক্ষনীয়।

১) (আমি - শিকারী) দৃষ্টান্ত চরণ 'তাহারা (শিকারীরা) ও তোমার মতন' (৮৮)। এখানে কবি নিজের অথবা পাঠকের কথা বলছেন। তাই কবিতার শেষ দুই চরণে তিনি বলতে পেরেছেন যে 'ওই মৃত মৃগদের মত/ আমরা সবাই' (৯৪-৯৫)। এভাবে 'আমি' আর 'তুমি'র জগত 'আমরা'-র বহুবচন জগতে পরিণত হওয়ায় কবিতাটিও অসাধারণত্ব লাভ করেছে। আর একটি কথা বিবেচ্য -- মৃগয়ার পর ভোজন হয়। শিকারীদের সঙ্গে 'আমি'(কবি)ও মৃত হরিণের মাংস খেয়ে ফেলেছে। শুধু কাব্যিক ভাষায় নয় সাধারণ ভাষায়ও মাংসভোজন ও নারীসম্ভোগ ভিন্ন নয়।

২) ('আমি' - হরিণ) দৃষ্টান্ত চরণ; ১) 'আমার হৃদয় - এক পুরুষহরিণ' (৫৬) ২) কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার; বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে, / আমি তাদের ঘ্রাণ পাই যেন, ' (৬--৮)

৩) 'আমি'- মৃগী (ঘাইহরিণী) দৃষ্টান্ত চরণ; ১) 'তাদের (হরিণদের) পেতেছি আমি টের'(৪০)। ২) 'এই হরিণীর মত তুমি বেঁচেছিলে নাকি' (৭২)

এই 'বৃন্দাবনে' সমস্ত কিছু স্থায়ী নয়, অচলও নয়। সবকিছু কম্পমান, প্রত্যেক মুহূর্তে পরস্পর পরস্পরে পরিণত হয়ে বদলিয়ে যাচ্ছে। 'প্রেমের সাহস - সাধ - স্বপ্ন' পরক্ষণে 'ব্যথা, ঘৃণা আর মৃত্যু'তে পরিণত হয়; আবার মৃত্যুর মধ্যে থেকে গজিয়ে ওঠে কামনার পদ্ম। তাই আমাদের পরস্পরের পিছনে ধাওয়া করার আর শেষ নেই। আমাদের চোখে শান্তিপূর্ণ ঘুম আসেনা। দূরে বন্দুকের শব্দ শুনতে শুনতে 'একা একা শুয়ে' থাকতে আমরা বাধ্য।

দুটি কবিতার মধ্যে সত্যিকার তুলনামূলক আলোচনা অন্য উপলক্ষে করার প্রয়াস পাব।

লাইট অফ এশিয়া

- সীমা ঘোষ

Sarada Ukil as King Shuddhodana in Franz Osten's movie The Light of Asia, 1925.

১৯২৪ - ১৯২৫ সালে দ্যা গ্রেট ইষ্টার্ন কর্পোরেশন এবং মিউনিক ফটো প্লে কম্পানী যৌথভাবে গৌতম বুদ্ধের জীবনের উপর আধারিত একটি নির্বাক ছবি তৈরী করেছিলেন। ফ্রান্য অস্টিন (১৮৭৬-১৯৫৬) এবং হিমাংশু রায়ের (১৮৯২-১৯৪০) নির্দেশনায় The Light of Asia সিনেমাটি করা হয়। ভারতের পুণার গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল এডউইন আরলন্ড (১৮৩২-১৯০৪) এই সিনেমাটির (verse) কথাগুলি রচনা করেছিলেন। সিদ্ধার্থর ভূমিকায় ৺শ্রী হিমাংশু রায়, গোপার চরিত্রে ৺শ্রীমতী সীতা দেবী, মায়া দেবীর ভূমিকায় ৺শ্রীমতী রানী বালা, রাজা শুদ্ধোধনের চরিত্রে ৺শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল (১৮৮৮ --১৯৪০) অভিনয় করেন। আমার পিতা স্বর্গীয় সারদাচরণ উকিল সে যুগের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন। তিনি ছিলেন ৺শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য।

রাজা শুদ্ধোধনের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য শিল্পী নির্বাচন চলছিল, কিন্তু নির্বাচক মণ্ডলী ঠিক রাজার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কারুকে পাচ্ছিলেন না। আমার পিতার বলিষ্ঠ ও সুদর্শন চেহারায় তাঁরা আকৃষ্ট হন এবং আমার পিতাকে রাজা শুদ্ধোধনের ভূমিকায় অভিনয় করতে অনুরোধ করেন। এই সিনেমার শ্যুটিং রাজস্থানে করা হয়। বাবার কাছ থেকে এই বিষয়ে কিছু কিছু ঘটনা আমরা শুনেছি। সিনেমাটি সত্যিকারের প্রাকৃতিক দৃশ্যে শ্যুটিং করা হয়েছিল। একটি আউটডোর শ্যুটিংএর সময় জয়পুরের মহারাজার চিতাবাঘ একটি হরিণ শিকার করছে এই দৃশ্যটি সিনেমাতে দেখান হয়েছে। এছাড়া এতে আসল সোনার গহনা ও পোশাক ব্যবহার করা হয়েছিল। এই সিনেমা ভারতবর্ষে খুব জনপ্রিয় না হলেও জার্মানীতে বক্স অফিস হিট হয়েছিল।

ইতিপূর্বে আমার বাবা ৺শ্রী সারদাচরণ উকিল এবং দুই কাকা ৺শ্রী বরদাচরণ উকিল ও ৺শ্রী রণদাচরণ উকিল ও উকিল পরিবারের শিল্প সাধনা ও জীবন সম্পর্কে অঞ্জলি পত্রিকার জন্য লিখেছি। কিন্তু এই সিনেমাটি সম্বন্ধে আমার লেখা হয় নি। এটি যেহেতু বুদ্ধদেবের জীবনী, তাই হয়তো অনেকেই জানলে খুশী হবেন। আমার ৮৭ বছর বয়সে স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসায় বিস্তারিতভাবে লেখা সম্ভব হয়ে ওঠেনা, তবু যেটুকু মনে আছে তা আগামী প্রজন্মের জন্য রেখে গেলাম।

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে

- ভাস্বতী ঘোষ (সেনগুপ্ত)

তিন সমুদ্রের জলের মিলন শুনেছি যে বহুবার,
কন্যাকুমারী পুন্যতীর্থ ভারতের শেষ দ্বার।
ভূগোলের পাতায় জলের বিভাগ -- আছে তার প্রয়োজন,
আসলে কি কোনো তফাৎ আছে ? প্রশ্ন করে মোর মন !
মানুষের চিত্ত সব কিছুতেই বিভেদ দেখতে চায়,
আকাশ , মাটি , জল নিজের অধিকার ভেবে নেয়
সৃষ্টিকর্তার হিসেবে যে সবই এক পাতায় লেখা ;
প্রকৃতির নিঠুর ধ্বংসলীলায় নিভে যায় সব শিখা,
সেই নির্মম সত্যের কাছে নেই কোনো বিভাজন --
কোন দেশ , কোন জাতি , কে কার আপনজন।
এক ৎসুনামি খেলায় মেতেছিল ভারতের সমুদ্রতটে,
ৎসুনামির ধ্বংস জাপানকে দেখাল আরো কত কিছু ঘটে !
প্রকৃতির দাপটে মানুষ যখন অসহায় , অতি দীন
কোথায় হিসেব , কোথায় প্রযুক্তি -- সব তুচ্ছ , ক্ষীণ !
তাই প্রার্থনা , প্রণাম জানাই বিশ্ব ও প্রকৃতিরে,
দাঁড়িয়ে হেথায় ভারতের এই মানবসাগরতীরে ।।

পূজারিনী

- নমিতা চন্দ

পূজারিনী মীরা মন্দিরে জাগি
কোথা তুমি গিরিধারী,
তোমারি ধ্যানে কাটে নিশিগানে
ঝরে মোর আঁখিবারি,
কোথা তুমি গিরিধারী।
তোমারি বিরহে হিয়া যে আকুল
মিলনে আমারে করিও মধুর,
ওগো দয়াময় কোরনা বিফল
দাও সাড়া দাও , মোর দিকে চাও
কোরনা বিফল আমারে।
আমার প্রেমের আকুল কামনা
নিও মোর পূজাডালি
কোথা তুমি গিরিধারী।

আন্না আপনাকে

- শংকর বসু

আপনাকে পলমাত্র দেখেই নেমে আসে ঝড়
চুরমার হয় ভন্ড সমাজ, সাদা খদ্দর আর এলোমেলো শরীর
জন্ম দেয় লজ্জার পাহাড়, ভেঙে যায় সাংবিধানিক আড়ষ্ঠতার মাড়
তখন বেশ বুঝতে পারি কেন আপনার আসার দরকার ছিল।

আপনি নড়লেই ঝলকায় ক্যামেরার আগুন, লাইভ কভারেজ তবে
আপনি সেই বোকা ছেলেটি নন যে সরকারী গাড্ডায় তলিয়ে গেল
শুধু খবর হবার আশায়। আপনার সংবেদনশীলতার খবর আজও মনে আছে
জঙ্গল আর পাহাড়ের ঘামে আপনিই রক্তের গন্ধ পেয়ে কেঁদেছিলেন অঝোরে
কাঁটাতারের সিরসিরে বেড়ে ওঠা আপনার অঙ্গুলিহেলনে থেমেছিল ক্ষণকাল
যদিও কলমের এক আঁচড়ে বেমালুম সাফ মাটি জল নদীনালা
বন-মোরগের খেলা এখন ইকো-ট্যুরিজম।

আন্না, আপনি বারোদিন অনশন করে নড়িয়ে দিলেন কিন্তু
দশ বছরেও সেই মেয়ে পেলনা এক বিন্দু জল
নাক-মুখ দিয়ে গিলিয়ে তাকে জ্যান্ত রাখা জরুরী হলেও
খোঁজ নিলেন কি কী হলো তার
বুলেটের আগুন নেভাতে গিয়ে যে পোড়ালো অন্তর্বাস
পথের ধারে চূর্ণ দেহে শুধু জ্বলে দু চোখ
মনে পড়ে তার নাম ?

আপনার ইশারায় খুঁজে পেলাম নররাক্ষসের ঠিকানা
প্রতিরোধের তীব্র আলোড়ন যেন সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ
ভাসালো আমাকেও
তবু দ্বন্দ্ব তবু সংশয়
আমিও যেতে চাই
শুধু একবার আন্না, যাবার আগে শুধু একবার
দাঁড়াতে চাই আয়নার সামনে
বলতে চাই সব সত্যি কথা, আমি অপাপবিদ্ধ আপোষহীন।
পারছিনা, আন্না আমার জিব শুকিয়ে আসছে
প্রতিদিনের প্রতিনিয়ত বন্দোবস্তির স্মৃতি আমাকে বিক্ষিপ্ত করে চলেছে,
আপনি বাঁচান, মুক্ত করুন
মনের অন্ধকার গলিতে মোমবাতির আলো জ্বলুক
পূর্ব-পশ্চিমের জানলা এক ঝটকায় খুলে বলি -- আঃ কি আরাম !

চাওয়া পাওয়া

- শতরূপা ব্যানার্জ্জী

জীবনে অনেক কিছু না পাওয়া থেকে যায়
অনেক কিছুই সম্পূর্ণভাবে পাওয়া হয় না,
কিন্তু তবুও আশা মেটেনা,
মেটেনা স্বপ্ন সাজানোর তোড়জোড় ।

মনের গভীরে গিয়ে কেন
হিসেব করিনা না পাওয়াগুলোর
হিসেবের খাতা শুধু ভরে চলি ।
হয়তো দিনের শেষে রবির অস্তরাগে
আকাশপানে তাকিয়ে দুফোঁটা চোখের জলের বিনিময়ে
না পাওয়াগুলোকে মুছে ফেলি ।
কথার মাঝে জীবনের দিনলিপিতে
তারা কখনো সাঁতরে শামুক গুগলির মতন
ভেসে আসে,
কাঁপুনি দেয় মনের বালুচরে
কিন্তু পরোয়া না করে ঝেড়ে ফেলি,
কেন স্বপ্ন দেখি, কেন কবিতা লিখি,
কেন প্রেমের আভাস আজো খুঁজি ।
কেন বলতে পারিনা
"পাঁকে মোড়া হে দেব
তোমার পৃথিবী কত কদর্য মানুষে ভরা,
মনের কালো এত বেশী
যে সাদার প্রলেপ লাগানো বৃথা ।"

নোংরা নীচ মনের গভীরে
শকুনের মতন কুরে কুরে খাচ্ছে মানবিকতাকে,
দৃপ্ত চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যাচ্ছে
আনন্দের পরশটাকে ।

কেন তবু আজো চোখ মেলে তাকালে
গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা নীল আকাশটাকে
বড় নিজের বলে মনে হয় ।
কেন মোমবাতিতে আগুন জ্বালালে
তার কেঁপে যাওয়া শিখার মাঝে
প্রেম উঁকি মারে ।
কেন বৃষ্টিতে ভেজা নতুন সবুজ পাতার দোলানিতে
মন দুলে ওঠে ।
ভিজে মাটির গন্ধ কেন হাতছানি দিয়ে ডাকে,
কেন বলে উঠি, "ধন্য আমি এই পৃথিবীতে এসে" ।।

শরৎ, তুমি এলে সে তো নেই

- পূর্ণিমা ঘোষ

শরৎ তোমার হিমেল ভোরে
শিউলিগুলি পড়তো ঝরে
শিশির ভেজা ঘাসে ;
তুলে নিতেম যতন করে
মন যে আমার উঠতো নেচে
শিউলি ফুলের বাসে ।

তুমি এলেই, যে গাছটি ঘিরে
আমাদের যে ছোট্ট নীড়ে
লাগতো আনন্দের ঢেউ ।
সে শিউলি গাছ নেই যে আর
বিষাদ-ছায়ায় ঘেরে চারধার
শান্তি পাই না কেউ ।

গত বসন্তে নিয়েছে সে বিদায়
জানিনা সে আছে কোথায়
কেমন আছে মোদের ছেড়ে ?
শরৎ , তুমি কি রাখো তার খোঁজ ?
তুমি কি বলতে পারো আমায়
কে নিয়েছে তাকে কেড়ে ?

যাকে ঘিরে ছিল আনন্দ
কেন হল এমন নিরানন্দ
এ সংসার হল যে অসার ।
তোমার উৎসব, তোমার আগমনী,
তোমার সোনা রোদ, তোমার বনানী,
অর্থহীন লাগে যে আমার ।

লহ প্রণাম

৺কাজুও আজুমা

(জন্ম -- ১৯৩১ মৃত্যু -- ২০১১)

সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুরাগী বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কাজুও আজুমা দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৮শে জুলাই পরলোক গমন করেছেন। জার্মান ভাষা ও ভারতীয় দর্শনে উচ্চশিক্ষা লাভ করার সময় ঘটনাচক্রে 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ হাতে পেয়ে সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর রবীন্দ্রচর্চার , যে সাধনায় জীবনের শেষ কয়েক বছর রোগে পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি কিছুতেই ছেদ পড়তে দেননি। রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস কবিতা মূল বাংলায় পড়ার আগ্রহে তিনি এই ভাষাটি রপ্ত করেছিলেন। কবিগুরু এবং তাঁর রচনাসম্ভার নিয়ে শ্রী আজুমার লেখা বই প্রবন্ধ নিবন্ধ ও অনুবাদের সংখ্যা অজস্র। তাঁরই পরিকল্পনায় রবীন্দ্র রচনাবলীর ১২টি খণ্ড মূল বাংলা থেকে জাপানী ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে ছিল কবিগুরুর লেখা এবং কবিগুরুকে নিয়ে লেখা বই ও গবেষণা পত্রের বিশাল ভাণ্ডার। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার ব্যস্ততা সত্ত্বেও জাপানে রবীন্দ্রচর্চার প্রসারে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখে গিয়েছেন তা চিরকাল সবাই স্মরণ করবে।

২০০০ সালে বিশ্বভারতী থেকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে সম্মানিত শ্রী আজুমার মনে শান্তিনিকেতনের ছিল একটি অনন্য স্থান। সেখানে তিনি বার বার ছুটে যেতেন। ১৯৬৭ সাল থেকে কয়েক বছর তিনি বিশ্বভারতীতে জাপানী ভাষার অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯৯৪ সালে শান্তিনিকতনে তৈরি হয় নিপ্পন ভবন। কলকাতার সল্ট লেকে রবীন্দ্র-ওকাকুরা ভবন নামে পরিচিত ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটিও তাঁরই প্রচেষ্টার ফসল। শ্রী আজুমা তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্য দেশে-বিদেশে আরও বেশ কয়েকটি সম্মান ও উপাধিতে ভূষিত হন যার মধ্যে রবীন্দ্র পুরস্কার অন্তর্ভুক্ত।

শ্রী আজুমার মৃত্যুতে বাঙালী হারালো তার পরম সুহৃদকে। 'অঞ্জলি'র পক্ষ থেকে আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

- রুমা গুপ্ত

আমার স্বামী

- কেইকো আজুমা

আমার স্বামী আশী বছর বয়স হওয়ার কিছু দিন আগে প্রয়াত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মত শ্রাবণ মাসেই মারা গিয়েছেন উনি। মারা যাওয়ার কিছু দিন আগে আমাকে বার বার বলতেন, 'তোমাকে অনেকদিন বাঁচতে হবে, অ-নে- ক দিন।' উনি অন্য লোকের কথা সব বুঝতে পারতেন, কিন্তু নিজে কথা বেশী বলতেন না। অল্পদিনের মধ্যে চলে যেতে হবে, একথা কি উনি বুঝতে পেরেছিলেন ? জানি না।

আমার মনে হয় উনি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথেরই মত এ জগৎ থেকে চলে যেতে চাননি। ওনার বলা কথাগুলো এখনও আমার মনে বাজে।

উনি ছিলেন খুব ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ। প্রতিটি কাজে তাঁর আন্তরিকতা প্রকাশ পেত। অন্য লোককে সাহায্য করার জন্য সর্বস্ব দিয়ে দিতেও দ্বিধা করতেন না।

আরেকটি ব্যাপারে ওনার প্রশংসা না করে পারছি না, তা হোল বাংলা ভাষার প্রতি ভালবাসা। ভাষাটা শিখেও ছিলেন ভাল করে। অনেক সময় বলতেন, 'পরের জন্মে যেন বাঙ্গালী হয়ে জন্মাতে পারি।'

আমার সৌভাগ্য যে ওনার মত একজন ব্যক্তির সহধর্মিনী হতে পেরেছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, পরের জন্মেও যেন আমার দেখা হয় ওনার সাথে।

শ্রী কাজুও আজুমার নেতৃত্বে কলকাতার সল্টলেকে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র-ওকাকুরা ভবন। ২০০৭ সালে এর উদ্বোধন করেন জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে।

জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে

- মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত)

কাজুও আজুমা সেনসেই-এর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ১৯৬৯ সালে শান্তিনিকেতনে। উনি তখন বিশ্বভারতীতে জাপানী ভাষা বিভাগের দায়িত্বে। অবসর গ্রহণ করে আমার বড় জ্যাঠামশাই তখন থাকতেন শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীতে। দিন সাতেকের জন্য আমার দশ মাসের শিশুপুত্রকে নিয়ে শান্তিনিকতনে গিয়েছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ১৯৬৪ সালে জাপানে আসার পর সেটাই ছিল আমার প্রথমবার দেশে ফেরা। কোথা থেকে কিভাবে কার কাছ থেকে খবর পেয়েছিলেন জানিনা। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলায় স্ত্রী আর পুতুলের মতন মিষ্টি ফুট্‌ফুটে ছোট্ট দুই কন্যাকে সঙ্গে করে আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির আমার সঙ্গে আলাপ করতে। ওদের মুখে ঝরঝরে বাংলা শুনে আমরা তো অবাক ! সহজ , সরল , আন্তরিক ব্যবহারে মুহূর্তের মধ্যে আপন হয়ে উঠলেন -- যেন কতদিনের চেনা। জ্যাঠামশাইও বহুকাল কলেজে অধ্যাপনা করেছেন -- যদিও সাহিত্য নিয়ে নয়। দেখা গেল অল্প সময়ের মধ্যে ওরা দুজনে মগ্ন হয়ে গেলেন বাংলা সাহিত্য আর রবীন্দ্রনাথে। স্বভাবগম্ভীর জ্যাঠামশাইকে সেদিন বেশ খুশী খুশী দেখাচ্ছিল আজুমা সেনসেই-এর সঙ্গে আলাপের পর। আর ছোট্ট মেয়ে দুটি ? তারা টর্ টর করে বাংলা বলে, গান করে, নেচে মাতিয়ে রেখেছিল যতক্ষণ ছিল। সে স্মৃতি ভোলার না।

সেই শুরু। ওরা জাপানে ফেরার পরে আবার যোগাযোগ হয়। একটা সময় আমি বেশ কিছুদিন ওঁর বাড়ীতে গিয়েছি লেখার ব্যাপারে সাহায্য করতে। বাংলা চর্চার সুযোগ পেয়ে আমি খুবই খুশী। এর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি নিজের মতন করে। আর এছাড়াও কারণে অকারণে কত সময় যে হাজির হয়েছি ওঁর কাছে। খুশী হয়েছেন। ব্যস্ততার মধ্যেও সময় দিয়েছেন। আবার কখনও বা কিছু কাজ নিয়ে নিজেই চলে এসেছেন আমাদের বাড়ীতে। বুঝেছি কাজটা জরুরী ঠিকই, তবে তা উপলক্ষ মাত্র। আসল উদ্দেশ্য বাংলা ভাষায় কথা বলা !!

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে "এপার বাংলা --ওপার বাংলা" নাম দিয়ে দুই বাংলাকে এক করে নানান আলোচনা , সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন একটা সময়। তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে ডাক পেয়েছি সব সময়ই।

সেই ১৯৬৯ সাল থেকে শুরু করে ২০১১ সাল। এই দীর্ঘ সময় ধরে আজুমা সেনসেই-এর সঙ্গে যোগাযোগ যেভাবেই হোক রয়ে গেছে শেষপর্যন্ত।

দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২৮শে জুলাই চলে গেলেন আজুমা সেনসেই। আমরা হারালাম এমন একজন বাংলা ভাষা প্রেমীকে , যাঁর অভাব সহজে পূরণ হবার নয়। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর যে বাঁধনহারা ভালবাসা ছিল তা যে কত গভীর , কত আন্তরিক , যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা সকলেই অনুভব করেছেন নিঃসন্দেহে। জাপানী হয়েও মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন যে কোন বাঙ্গালীর থেকেও একশো ভাগ বেশী বাঙ্গালী। বাংলার প্রতি এই যে ভালবাসা তার মূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ , যিনি শয়নে-স্বপনে -মননে একাকার হয়ে মিশে ছিলেন তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে। রবীন্দ্র প্রেমে আপ্লুত তিনি নিজের সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রচর্চাতে। জার্মান ভাষা ও সাহিত্য আর ভারতীয় দর্শন নিয়ে এম.এ পাশ করেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। চাকরী জীবনের শুরু য়োকোহামা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ভাষার অধ্যাপক হিসাবে। ততদিনে রবীন্দ্রনাথকে চিনতে শুরু করেছেন। রবীন্দ্রভাবনায় মন ডুবে যাচ্ছে ক্রমশ। তাই অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে নিয়মিত রবীন্দ্রচর্চা করে চলেছেন নেশার মতন। ইতিমধ্যে বিশ্বভারতী থেকে ডাক আসে জাপানী ভাষা পড়াবার। একই সঙ্গে ডাক আসে জার্মানী থেকেও। রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে যোগ দেন বিশ্বভারতীতে। মাত্র এক বছরের চুক্তিতে বিশ্বভারতীতে গিয়েও শান্তিনিকেতনের টানে থেকে যান প্রায় সাড়ে তিন বছর। জাপানে ফিরে এসেও বারে বারে ছুটে গেছেন প্রিয় শান্তিনিকেতনে অসুস্থতার বাধা অগ্রাহ্য করে।

গত নভেম্বর মাসে ওঁকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম আমরা কয়েকজন। রোগে ক্লিষ্ট, বাক্‌রুদ্ধ সেনসেইকে দেখে চোখে জল এসে গিয়েছিল। সেই সদাহাস্যময় কর্মব্যস্ত মানুষটির এই রূপ দেখতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়েছে। আরও আগে যখন বাক্‌রুদ্ধ হননি তখন কেন একবার আসিনি ওঁর কাছে ভেবে নিজেকে দোষারোপ করেছি। তবে চিনতে পেরেছেন দেখে তারই মধ্যে একটু স্বস্তি বোধও করেছি। ওঁর লেখা আর অনুবাদ করা কয়েকটি বই উপহার পেয়ে মনটা ভরে গেছে সেদিন।

রবীন্দ্র অনুগত প্রাণ ছিল বলেই কি চলে যাবার তারিখটা গুরুদেবকে অনুসরণ করে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে -- ১২ই শ্রাবণ। প্রকৃতির নিয়মে মানুষকে একদিন এই জীবনের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে বিদায় নিতে হয়। সব জেনেও বিচ্ছেদ বেদনাটা থেকেই যায়। তাই বিশ্বাস করতে মন চায় সেই কোন যুগে উচ্চারিত অমরবাণীকে –

অজো নিত্যঃ শাশ্বত হয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

(এই আত্মা জন্মরহিত শাশ্বত ও পুরাতন। শরীরকে হনন করিলেও ইনি নিহত হন না।)

আজুমা সেনসেই সম্বন্ধে সামান্য কথা

- সেৎসু তোগাওয়া (মাকিনো)

আমি যখন আজুমা সেনসেই-এর মৃত্যুসংবাদ পাই তখন শান্তিনিকেতনে ছিলাম । এখন শান্তিনিকেতনেও টেলিফোনের সুবিধা হওয়াতে ২৮শে জুলাই সকালের মধ্যেই খবরটা পেয়ে গিয়েছিলাম । এই খবরে শান্তিনিকেতনের অনেকেই খুব দুঃখ পেয়েছেন । কারণ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আজুমা সেনসেই-এর গভীর সম্পর্ক অনেক অনেক বছরের । উনি শান্তিনিকেতনকে এত ভালবাসতেন যে এক এক সময় বলতেন "শান্তিনিকেতন আমার দ্বিতীয় বাড়ি ।" শান্তিনিকেতনে ওনার ভক্তও অনেক ।

আজুমা সেনসেই-এর মৃত্যুসংবাদ শান্তিনিকেতনে পৌঁছানোর পর প্রথমে নিপ্পন ভবনে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল । এছাড়া তাঁর আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কাঁচমন্দিরে । আমার দুটো অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয় । নিপ্পন ভবনের অনুষ্ঠানে জাপানী বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন , আর সেনসেই-এর পুরোনো বন্ধুরা স্মৃতিচারণ করেন । ৫ই আগষ্ট কাঁচমন্দিরে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও মন্ত্রপাঠ হয় । আজুমা সেনসেই সম্পর্কে খুব সুন্দর বললেন বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আমাদের সোমেনদা), যিনি প্রথম থেকেই সেনসেই-এর খুব কাছের মানুষ ছিলেন । সেদিনকার স্মৃতিচারণায় সোমেনদা শান্তিনিকেতনের সঙ্গে জাপান ও জাপানীদের সম্পর্ক নিয়েও বলেছিলেন । মন্দিরের অনুষ্ঠান তো সবসময় ভাল হয়, ভাল লাগে । আমার মনে হয় এতে সবচাইতে আনন্দ, শান্তি ও তৃপ্তি পেয়েছেন আজুমা সেনসেই নিজে । কারণ, আমাদের এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম, যখন সেনসেই হাসপাতালে ছিলেন, তখন অন্য কথায় প্রতিক্রিয়া না হলেও , একবার "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে" গানটি গাওয়া হলে তা শুনে ওনার মুখে নাকি মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল ।

আজুমা সেনসেই-এর সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই ছোটবেলায় শান্তিনিকেতনে । শান্তিনিকেতনে জাপানী ভাষার অধ্যাপনার পালা শেষ করার পরেও উনি বার বার সেখানে গিয়েছেন । আমি যখন ক্রমশ বড় হলাম, মা-বাবা তখন আমাকে জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার কথা ভাবতে লাগলেন । ঠিক হল আমি জাপানের 'রেইতাকু বিশ্ববিদ্যালয়ে' পড়বো । তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে আজুমা সেনসেই আমাকে নানান দিক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন । ভর্তি হওয়ার পরেও, যেহেতু একই চিবা জেলাতেই থাকতাম, তাই মাঝেমধ্যেই ওনার বাড়িতে যেতাম । তখন কেইকো সেনসেই (আজুমা সেনসেই-এর স্ত্রী) মায়ের মত আমাকে আদর-যত্ন করতেন । কেইকো সেনসেই-এর বাঙালী রান্না ছিল অসাধারণ । ওনাদের বাড়িতে গেলে কোথায় যেন বাংলার স্বাদ পেতাম । আমার মা-বাবা যেমন শান্তিনিকেতনে জাপানী অতিথিদের আশ্রয় দিতেন ও আপ্যায়ন করতেন, তেমনি দেখেছি জাপানে আগত বাঙালী অতিথিদের আজুমা সেনসেই ও কেইকো সেনসেই সর্বদা ওঁদের বাড়িতে স্বাগত জানাতেন । আজুমা সেনসেই রবীন্দ্র-ভক্ত তো ছিলেনই, সেইসঙ্গে বাংলা, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার মানুষকেও খুব ভালবাসতেন । একই ব্যাপার নজর করেছি কেইকো সেনসেই-এর মধ্যেও । দেখেছি, ওনারা দুজনে মিলে সবসময় একই লক্ষ্যের দিকে একসঙ্গে এগিয়েছেন ।

আজ এই সুযোগে আমি সেনসেই-এর চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি এবং ওনার আত্মার শান্তি কামনা করছি ।

খোলা চিঠি

- আলপনা ভট্টাচার্য

আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে স্বপ্ন (দিবাস্বপ্ন নয়) দেখেছিলুম আমি জাপানে গেছি, ভেবেছিলাম স্বপ্ন-স্বপ্নই । তালেগোলে আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে, আমি আমার স্বপ্নের দেশে সত্যি সত্যি ঘুরে এলুম ।

জাপানে ভাস্বতী এবং বিশ্ব আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়েছে, অনেক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে । সেসব কথা সুযোগমত লিখব । নিপ্পন বেদান্ত সোসাইটির শ্রী মেধসানন্দজী মহারাজের সঙ্গে পরিচয়ে খুব খুশী হলুম । শ্রীমতী রুমা গুপ্ত, শ্রী গৌতম গুপ্ত, শ্রীমতী করবী মুখার্জী, শ্রীমতী মঞ্জুলিকা হানারি, শ্রী সমুদ্র দত্তগুপ্ত এবং আরো অনেকের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয় । সকলের সঙ্গে পরিচয়ে খুব আনন্দ হল ।

বেঙ্গলী এ্যাসোসিয়েশন অফ টোকিও জাপান (BATJ) থেকে 'অঞ্জলি' নামের যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, সেটির ২০১০ সংখ্যা পেয়ে খুব খুশী হয়েছি । জাপানে বসে এত সমৃদ্ধ একটি পত্রিকা প্রকাশ করা যে সোজা কাজ নয়, সেটা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য । ২০১০এর পুজোসংখ্যা, রবীন্দ্রসার্ধশতবর্ষের কথা মাথায় রেখে কবির প্রতি এক অপূর্ব সুন্দর শ্রদ্ধাঞ্জলি । পত্রিকাটির লেখাগুলি অতি আকর্ষক । কম বয়সী ছেলেমেয়েদের আঁকা, লেখাও এতে স্থান পেয়েছে । আশাকরি এ বিষয়টি স্বল্পবয়সীদের উৎসাহিত করবে ।

ভারতবর্ষের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী একদা সারা বিশ্বের মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল, একদা বহু জাপানি ব্যক্তিত্ব ঐ তীর্থক্ষেত্রে এসেছিলেন এবং রবীন্দ্রচর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন । 'অঞ্জলি'র কয়েকটি পাতায় জাপানিদের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধীয় লেখাগুলো পত্রিকার আকর্ষণ বাড়িয়েছে । আশা করি জাপানিদের যেসব লেখা বাংলায় প্রকাশিত, সেগুলি তাঁদের নিজের লেখা, অনুবাদ নয় । কাজুহিরো ওয়াতানাবের লেখাটি পড়ে কিছু নতুন বিষয় শিখলুম (আমার পড়াশুনা অতি অল্প), লাভবান হলুম । আমরা যখন জাপানে গেছিলুম ১৩।০১।২০১১ তারিখে, তখন অধ্যাপক আজুমা অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন । পরে জেনেছি তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন । ভাস্বতী আমাকে জানিয়ে ছিল এবং আনন্দবাজার পত্রিকায় খবরটা পড়েছিলুম । ওনার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই । ইয়োরোপীয়ানদের রবীন্দ্রচর্চার খবর মাঝে মধ্যে চোখে পড়লেও জাপানিদের রবীন্দ্রচর্চা প্রসঙ্গ শুধুমাত্র পণ্ডিতদের লেখাতেই সীমাবদ্ধ । কিওকো নিওয়া লিখিত 'জাপানে রবীন্দ্রনাথ' পড়ে মনে আশা জাগছে, একদিন সত্যিই বাস্তবায়িত হয়ে উঠুক ওঁর লেখাটির শেষ কয়েক ছত্র । আমাদের দেশের পত্রপত্রিকাগুলো অন্তত এবছরে অর্থাৎ রবীন্দ্রসার্ধশতবর্ষে সাধারণের কাছে বাংলা, ইংরেজী, সম্ভব হলে হিন্দীতেও এই বিষয়গুলো প্রচার করলে তবে বোধহয় পরবর্তী প্রজন্ম রবীন্দ্রচর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠবে ।

'অঞ্জলি'র এই সংখ্যার সকল লেখাই আকর্ষক । প্রচ্ছদটি ভূয়সী প্রশংসার দাবিদার । 'অঞ্জলি'র প্রতিটি রচনা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবু লিখছি স্বামী মেধসানন্দজীর রচনাটি আমার জন্য বিশেষ প্রাপ্তি । সব শেষে জানাই অর্মত্য মুখার্জীর (Grade 6) 'The Parcel' লেখাটি আমাকে অত্যন্ত শান্তি দিল । ভারতীয় ডাকবিভাগের অপদার্থতা নিয়ে আমরা বিরক্ত, এই বিভাগকে নিয়ে আমরা হাসাহাসি করে থাকি । জাপানের মত নিয়মানুবর্তী, এত উন্নত এবং স্বল্পসংখ্যক মানুষের দেশে যদি এরকম বিভ্রাট হতে পারে, তবে আমাদের এই বিশাল ভারতবর্ষে কুঁড়ের বাদশা অসংখ্য লোকে পরিপূর্ণ দেশে এরকম ঘটনা তো খুবই স্বাভাবিক ।

মনোমুগ্ধকারি ছবিতে এবং লেখায় ভরা 'অঞ্জলি' আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক, এই শুভকামনা জানাই পত্রিকার লেখক, পাঠক, অঙ্কনশিল্পী এবং সম্পাদকমণ্ডলীকে । ভালোবাসা পাঠাই সকলের জন্য ।

আমরা জাপান থেকে দেশে ফেরার অল্পদিন পরেই যে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক প্রকোপ জাপান সহ্য করেছে, সে অতি বেদনাদায়ক । জাপানে যাঁরা এই দুর্যোগে বিধ্বস্ত তাঁদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি সত্ত্বেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁরা সাময়িক কষ্ট পেয়েও ভাল আছেন জেনে । আশাকরি সবার সঙ্গে আবার দেখা হবে । সমস্ত জাপানবাসীর জন্য শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা পাঠিয়ে চিঠি শেষ করলুম ।

আলপনা ভট্টাচার্য
কদমা, জামশেদপুর
ভারতবর্ষ